অদৃশ্য দুটি হাত
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

অদৃশ্য দুটি হাত–৮৪

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুর বৃদ্ধের মুখমণ্ডলে গভীর একটা ব্যথার আভাস দেখতে পেল, বললো— থাক, তোমার কষ্ট হলে বলো না।

বৃদ্ধ বলে উঠলো— না না, বলবো; আমি সব বলবো। শুধু তোমাকে নয়, বহু লোককে বলেছি যদি কেউ আমার মেয়েকে খুঁজে দেয়... জেকীকে কোনদিন আর ফিরে পাবো না, কিন্তু আমার কন্যা সে তো আর মরেনি!

বলো কি, তোমার সন্তান— তোমার সেই শিশুকন্যা মরে যায়নি? সে তাহলে জীবিত আছে?

হাঁ, কি বলছিলাম— এসে দেখলাম জেকী মরে গেছে আর আমার কন্যাটি উধাও হয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো বৃদ্ধ, তারপর আবার সে বলতে শুরু করলো— জেকীকে ঘুমিয়ে রেখে আমি সেই পর্বতমালার পাদমূলে জেকীর সন্ধান করে চললাম। ক্ষুধা-পিপাসার কথা ভুলে গেলাম, ভুলে গেলাম জকীর কথা। জেকীর চিহ্নস্বরূপ জেকীর কন্যাকে আমি বুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইলাম। একদিন দু'দিন তিনদিন করে কেটে গেল একটি মাস। জঙ্গল থেকে ফল নিয়ে খেতাম আর সন্ধান করতাম আমাদের কন্যাটির। জান বাবা, একদিন আমি পেয়ে গেলাম আমার কন্যাটিকে।

বলো কি!

হাঁ, অনেক সন্ধান করার পর একদিন আমি অন্যমনস্কভাবে পর্বতমালার ধার ধরে এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়লো একটা বড় বাঁকা গাছের ডালে বসে আছে এক বানরী ....

বনহুরের মুখমণ্ডল মুহূর্তে দীপ্ত হয়ে উঠলো, বললো সে —বলো, বলো, তারপর কি দেখলে?

বৃদ্ধ বললো— দেখলাম বানরীর কোলে আমাদের সেই শিশুকন্যা ...

তারপর, তারপর কি করলে তুমি?

আমি খুশি হলাম, ভাবলাম জেকী গেছে যাক কিন্তু তার কন্যাটিকে আমি ফিরে পাব..... তারপর হতাশভরা কণ্ঠে বললো— কিন্তু ফিরে আর পেলাম না! বানরী তাকে নিজের কন্যা বানিয়ে নিয়েছে।

আমি সেই পর্বতের পাদমূলে দিনের পর দিন কাটাতে লাগলাম যদি কোনক্রমে বানরী ওকে ছেড়ে দেয় তাহলেই আমি ওকে নিয়ে পালিয়ে যাবো কিন্তু সে আশা আমার বিফল হলো। পুরো একটি বছর ধরে আমি ক্ষুধা-পিপাসা বর্জন করে শুধু আমার জেকীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কন্যাটিকে পাবো বলে বানরীর পিছু পিছু ঘুরেছি ... বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো বৃদ্ধের কণ্ঠ।

বনহুরের মনে পড়লো এমনি আরও এক বৃদ্ধের কথা। সেও তার কাছে এমনি করে শুনিয়েছিল। বিস্ময়কর এক কাহিনী। বনহুর বললো— তুমি কি করলে তারপর।

যখন আমি নিজে বানরীকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হলাম না, কন্যাকেও ফিরে পেলাম না, তখন নিজে পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম স্বদেশের উদ্দেশে। পথে নানা বিপদে পড়লাম, বহুবার মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পেলাম। তবু ভুলতে পারলাম না জেকীর কন্যাকে। একদিন দেশে এলাম, দেখলাম আমার বাড়িঘর সব নিলাম হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব তারা আমাকে চিনেও চিনলো না, তাদের ভয় যদি আমি তাদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে বসি। আমি তাদের কাছে শুধু আমার জেকীর কন্যাটিকে উদ্ধারের জন্য বললাম। বললাম, তোমরা আমার সব সম্পত্তি নিয়েছো দুঃখ নেই। তোমরা আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো, তোমরা বানরীর কোল থেকে আমার সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে দাও। জান বাবা, কেউ আমার কথায় কান দেয়নি, সবাই আমাকে পাগল বলে উপহাস করেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে দূর দূর করে। ডুকরে কেঁদে উঠলো বৃদ্ধ, তারপর বললো— দেশের লোক যখন আমাকে পাগল বলে তাড়িয়ে দিল তখন আমি আর দেশে রইলাম না। আর কেনই বা থাকবো, ওরা তো আমার কন্যাকে উদ্ধার করে দেবে না, তাই আমি দেশে দেশে খুঁজে ফিরছি .. ..

কাকে, তোমার জেকীর কন্যাকে?

না।

তবে?

যে আমার জেকীর কন্যাকে সেই বানরীর কাছ থেকে উদ্ধার করে দেবে, তাকে।

সত্যি তাকে তুমি খুঁজছো?

হাঁ বাবা।

এখনও তার কথা তোমার মনে আছে?

আছে। আমার জেকীর মেয়ে, তাকে আমি কি ভুলতে পারি।

সে আজ কতদিনের কথা ঠিক বলতে পার?

পারি।

তবে বলো কতদিন আগে জেকীসহ তুমি সেই পর্বতমালার পাদমূলে গিয়ে পৌঁছেছিলে?

বৃদ্ধ চুপ থেকে ভাবলো কিছুক্ষণ, তারপর আংগুলে বিড় বিড় করে কি গুণলো, তারপর হঠাৎ বলে উঠলো— ঠিক মনে পড়েছে, সেই দিন ছিল রবিবার, যেদিন আমার জাহাজডুবি হয়.... ১৯৫১ সালে।

বলো কি বাবা, ২৫ বৎসর আগের কথা?

হাঁ, কিন্তু আমার মনে হয় এই তো সেদিনের কাহিনী।

এর মধ্যে তুমি আর কোনদিন যাওনি সেই পর্বতমালায়? বনহুর প্রশ্ন করলো ওকে।

বৃদ্ধ বললো— গিয়েছিলাম, জেকীর অনুরোধে।

সেকি, জেকী তো মরে গেছে বললে?

না মরেনি, এতক্ষণ মিথ্যা কথা বলছিলাম।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো বনহুর— তোমার স্ত্রী জীবিত আছে।

হাঁ, ফিরে আসার সময় আমার জেকীকে আমি সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম।

সত্যি?

হাঁ সত্যি। জান মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস আমার নেই, ছিলও না কোনদিন।

তবে যে এতক্ষণ মিথ্যা বলছিলে?

বললাম তো মিথ্যা বলার অভ্যাস আমার নেই। জেকীকে সেই পর্বতমালার পাদমূলে ছেড়ে আসবো, এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে? যে জেকী আমাকে এক মুহূর্ত না দেখলে থাকতে পারে না, আমি তাকে ছেড়ে আসবো সেখানে একা রেখে? ঠিক তুমি পাগল—পাগল না হলে এমন কথা বলো!

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো— তোমার জেকী জীবিত আছে?

হাঁ— হাঁ আছে। আমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারি না, ও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

কোথায় তাকে রেখে এসেছো?

হঠাৎ বৃদ্ধ হাঃ হাঃ করে ভীষণভাবে হেসে উঠলো, তারপর বললো— সে আমার সঙ্গেই আছে .....

সঙ্গে আছে! বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো বনহুর।

বৃদ্ধ বললো— দেখবে তাকে?

এ তুমি কি বলছো।

জেকী বড় অভিমানিনী, তাই ওকে সঙ্গেই রাখি। যদি কোনদিন ভুল করে রেখে আসি তাহলে আমার নিস্তার নেই। সমস্ত দিন সে আমার সঙ্গে কথাই বলবে না...

তাই নাকি, কিন্তু কোথায় সে?

এই তো আমার কাছে .... একটা পুঁটলি ওর পিঠে বাঁধা আছে এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি বনহুর। এবার লক্ষ্য করলো সে, পুঁটলিটা বৃদ্ধ খুলে নিল পিঠ থেকে, তারপর পুঁটলির গিট খুলে ফেললো।

বনহুরের চক্ষুস্থির— বৃদ্ধের পুঁটলির মধ্যে একগাদা কঙ্কাল— মানুষের কঙ্কাল।

অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর— একি!

বৃদ্ধ হেসে কঙ্কালের গাদার উপর সস্নেহের হাত বুলিয়ে বললো— এই তো আমার জেকী, আমার প্রিয়তমা, আমার স্ত্রী .... ওকে কি আমি ছেড়ে থাকতে পারি।

বনহুর হতবাক হয়ে যায়, কোন কথা বের হচ্ছে না তার মুখ দিয়ে, নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত তাকিয়ে আছে সে ঐ হাড়গুলোর দিকে। বনহুরের চোখের সম্মুখে জীবন্ত হয়ে উঠে একটি নারীমুখ— সে ঐ জেকী ... একটি ভাসমান লাইফবয়ে চেপে ওরা দু'জন এসে নামলো সমুদ্র উপকূলে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নেমে দাঁড়ালো বালুচরে। স্ত্রীকে ধরে আছে স্বামী, গর্ভবতী স্ত্রীর যেন কোন কষ্ট না হয়। ওরা তাকায়— সম্মুখে সীমাহীন বালুরাশি, পিছনে অথৈ সমুদ্র। দূরে নজর পড়ে, দেখা যায় পর্বতমালার সুউচ্চ রেখা। ওরা অনেক কষ্টে এসে পৌঁছায় পর্বতমালার পাদমূলে। স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়, স্বামী ব্যাকুল হয়ে উঠে। স্ত্রী একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান প্রসব করে। স্বামীর চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো, ভুলে গেল সে সব ব্যথা-বেদনা কষ্ট। কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে স্বামী— কত আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগে তার মনে। স্ত্রী পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে। স্বামীর কাছে সে নিজের পিপাসার কথা জানায়। পানির সন্ধানে যায় স্বামী কিন্তু

ফিরে এসে আর সে স্ত্রীকে জীবিত দেখতে পায় না... স্ত্রীর মৃত্যু স্বামীকে উন্মাদ করে তোলে, কাঁদে সে ডুকরে .... কিন্তু জেকী আর চোখ মেলে চায় না....

দেখছো, আমার স্ত্রীকে দেখছো তুমি? ভারী সুন্দর আমার জেকী, তাই না?

বৃদ্ধের কথায় বনহুরের চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বলে সে —এ্যা, কি বললে?

বললাম আমার স্ত্রী জেকী খুব সুন্দর, তাই না?

হাঁ। ছোট্ট একটা শব্দ বের হয় বনহুরের কণ্ঠ দিয়ে। একটু পর পুনরায় বলে বনহুর— এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তুমি তোমার স্ত্রীর কঙ্কাল বহন করে বেড়াচ্ছো?

কঙ্কাল! কিসের কঙ্কাল? একে তুমি তাহলে চিনতে পারনি? আমার জেকী, আমার স্ত্রী.... হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি পাগল না হলে এমন কথা বলো! জান, জেকী আমার সঙ্গে কথা বলে, হাসে, গান গায়।

সত্যি।

হাঁ সত্যি, আমি তো বলেছি মিথ্যা বলার অভ্যাস আমার নেই।

আচ্ছা বাবা, তুমি যদি তোমার সেই হারানো কন্যাকে ফিরে পাও, বানরীর কাছ থেকে তাকে যদি উদ্ধার করে এনে দিই?

পারবে না, পারবে না— তোমরা কেউ তাকে বানরীর কাছ থেকে আনতে পারবে না। কত লোককে বলেছি, কেউ রাজি হয়নি আমার সন্তানকে এনে দিতে। তুমি পাগল, তাই বলছো পারবে।

আমি বলছি পারবো।

সত্যি পারবে?

হাঁ। কিন্তু সে তো এখন আর সেই ছোট্টটি নেই। এখন সে অনেক বড় হয়েছে, পঁচিশ বছর তার বয়স হয়েছে। তাকে দেখলে চিনবে কি করে?

ঠিক চিনবো। আমার জেকীর মেয়েকে আমি চিনবো না তো কে চিনবে? আমি ঠিক চিনবো ....

বনহুর খুশি হলো— যা হোক রহস্যময়ীর আসল পরিচয় সে জানতে পারল, জানতে পারল কে তার পিতা এবং মাতা।

বৃদ্ধ তখন যত্ন সহকারে জেকীর হাড়গুলো পুঁটলি করে বাঁধছে।

বনহুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেয় এবং তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় আস্তানায়। অবশ্য আস্তানায় নিয়ে যাবার সময় ভালভাবে চোখে পট্টি বেঁধে নেয়।

❑

আশার আনন্দ ধরে না, রহস্যময়ী এখন অনেকটা সভ্য হয়েছে। সে কাপড় পরতে শিখেছে, এখন সে আর উলঙ্গ থাকে না। চুল আঁচড়াতে শিখেছে, এমন কি খোঁপা বাঁধতে শিখেছে। কথা স্পষ্ট বলতে না পারলেও একটু একটু বলতে শিখেছে।

রোজ আশা ওকে নিয়ে ঝর্ণার ধারে যায়। ঝর্ণার সচ্ছ পানিতে ওকে নিয়ে সাঁতার কাটে। আশা রহস্যময়ীর নাম দিয়েছে শাপলা। ওকে শাপলা বলে ডাকলে খুব খুশি হয় ও।

আশা যখন ওকে নিয়ে আস্তানার বাইরে যায় তখন ওর দেহে কালো আবরণ থাকে। অবশ্য আশা নিজেও কালো আবরণে দেহ আচ্ছাদিত করে নেয়। ওকে শহরে নিয়ে যায় আশা— সভ্য মানুষের কার্যকলাপ কেমন শিখাবার চেষ্টা করে সে ওকে।

যানবাহন দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যায় শাপলা, গাড়িতে বসে আশাকে আঁকড়ে ধরে সে।

আশা ওকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠ চাপড়ে অভয় দেয়।

আজকাল শাপলা সব সময় আশার কাছে কাছে থাকে, এক মুহূর্ত দূরে সরে যায় না। আশা ওকে নিয়েই খেতে বসে, ওকে নিয়েই বেড়ায়, ওকে নিয়েই ঘুমায়।

সেদিন সকাল বেলা আশা রহস্যময়ী শাপলাকে নিয়ে ঝর্ণার সচ্ছ পানিতে সাঁতার কাটছিল, এমন সময় অশ্বপৃষ্ঠে বনহুর এসে দাঁড়ায় সেখানে। অবশ্য ইচ্ছা করেই বনহুর অশ্বের গতিরোধ করে ফেলে। দেখতে পায় দুটি নারী ঝর্ণার পানিতে সাঁতার কাটছে।

প্রথমেই বনহুর চিনতে পারে আশাকে কিন্তু তার সঙ্গীটিকে চিনতে পারে না।

বনহুর চলে আসে আস্তানায়।

হিন্দল আস্তানা এটা।

অনুচরগণ সর্দারকে কুর্ণিশ জানায়।

রামসিং এসে দাঁড়ালো— সর্দার!

বনহুর অশ্ব-বল্গা রামসিংয়ের হাতে দিয়ে বললো— সংবাদ কি রামসিং?

ততক্ষণে অপর একজন অনুচর রামসিংয়ের হাত থেকে তাজের লাগাম গ্রহণ করেছে।

রামসিং বললো— সর্দার, রহস্যময়ী এখন অনেকটা সভ্য হয়ে এসেছে।

কথাটা শুনে বনহুর খুশি হলো, একটা বিরাট দুশ্চিন্তা ছিল তার মনে, না জানি রহস্যময়ী এখন কেমন আছে। আশার চেষ্টা সফল হবে কিনা সন্দেহ ছিলো তার মনে। বললো বনহুর— আশা কোথায়?

একজন বললো— রহস্যময়ীকে নিয়ে সে ঝর্ণার ধারে গেছে।

বনহুর এবার বুঝতে পারল ঝর্ণার ধার হয়ে আসবার সময় সে যে দু'টি নারীকে স্নান করতে দেখলো ওরা একজন আশা, অপরজন রহস্যময়ী। উচ্ছল হয়ে উঠলো বনহুরের মন, মস্তবড় একটা সমস্যার যেন সমাধান হয়েছে।

বনহুরের ইচ্ছা হলো ছুটে গিয়ে আশাকে ধন্যবাদ জানায় কিন্তু ঝর্ণার ধারে ওরা এখন স্নানে মত্ত, কাজেই যাওয়া তার উচিত হবে না।

বনহুর বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলো।

অল্পক্ষণ পরই আশা এলো সেখানে, সঙ্গে তার এক রমণী। আশা বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো— আমার সঙ্গিনীটিকে চিনতে পারছো বনহুর?

বনহুর তীক্ষ্মদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো রমণীর দিকে।

পিছনের রমণী রহস্যময়ী। সে বনহুরকে দেখামাত্র জড়োসড়ো হয়ে আশার পিছনে লুকিয়ে পড়লো।

বনহুর হেসে বললো— আশা, কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না। আমি ভাবতেও পারিনি ওকে এমন অবস্থায় দেখতে পাবো।

আশা বললো— তোমার আশীর্বাদ আমাকে জয়ী করেছে বনহুর। আমি নিজেও ভাবতে পারিনি বানরী কন্যাকে মানুষ হিসেবে তৈরি করতে পারবো। জান বনহুর, রহস্যময়ী এখন শাপলা হয়েছে।

শাপলা!

হাঁ।

বড় সুন্দর নাম দিয়েছো ওর। সত্যি শাপলাই বটে। আশা, ও আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে বুঝি?

হাঁ, শুধু তোমাকে কেন, যে কোন পুরুষ দেখলেই ভয়ে কুঁকড়ে যায়। ও হয়তো মনে করে আবার তোমরা ওর গলায় ফাঁস পরাবে।

বনহুর হেসে বললো—ঠিক তাই হবে। আচ্ছা আশা, ওকে কি করে এত অল্প সময়ে এমন সভ্য বানালে? ঠিক তোমার মতই কাপড় পরেছে। সুন্দর করে চুল আঁচড়ে নিয়েছে— সবই তো সুন্দর দেখছি। কথা বলতে শিখেছে কিছু?

কিছু কিছু তবে আরও সময় লাগবে।

আশা, একটি শুভ সংবাদ এনেছি।

কি সংবাদ?

রহস্যময়ী, মানে তোমার শাপলার বাবার সংবাদ। আমি তাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি।

শাপলার বাবা!

হাঁ, সব তোমাকে বলবো। শাপলার বাবা আমার কান্দাই আস্তানায় আছে। ইচ্ছা করলে তাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতাম কিন্তু আনিনি, কারণ সে পাগল প্রায়। তার কন্যা শাপলার সন্ধান করতে করতে সে পাগল হয়ে গেছে। আমি তাকে কথা দিয়েছি তার কন্যাকে তার হাতে তুলে দেব। তাই হিন্দল ছুটে এলাম রহস্যময়ীকে দেখতে। তার পিতাকে সে ফিরে পেলে হত্যা করে বসবে না তো?

না, রহস্যময়ী এখন আর রাক্ষসী নেই, মানবীতে রূপ নিয়েছে।

রহস্যময়ী বনহুর আর আশার কথাবার্তা সব শুনতে পাচ্ছিলো তবে বুঝতে পারছিল না কিছু।

হাজার হলেও সে নারী, তাই নারীসুলভ লজ্জা ছিল তার মধ্যে। বারবার সে তাকাচ্ছিলো লজ্জাভরা দৃষ্টি নিয়ে বনহুরের দিকে।

বনহুর ওর নাম ধরে ডাকলো—শাপলা! এসো, এসো আমার কাছে ...

বনহুরের মুখে নিজের নাম শোনামাত্র সে একদৌড়ে পালিয়ে গেল, আশা ওকে ধরে রাখতে পারল না।

বনহুর বললো— আশা, ওর বাবা বৃদ্ধ এবং পাগলপ্রায়, তাই আমি তাকে সঙ্গে আনিনি। রহস্যময়ী যখন বুঝতে শিখবে বাবা-মা কে হয় তখন আমি তাকে নিয়ে আসবো।

হাঁ, তাই এনো। এখন ও তার বাবার পরিচয় পেলেও বুঝবে না কিছু।

আশা, তোমাকে আরও কিছুদিন কষ্ট করতে হবে, তোমাকে থাকতে হবে হিন্দল ঘাটিতেই।

কিন্তু ....

জানি তুমি চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছো, তবু আমার অনুরোধ রাখবে না?

তোমার অনুরোধ না রেখে আমি পারি বনহুর?

বলো?

শাপলাকে আমি নিজের কাছে রাখবো।

বেশ তো, তাই রেখো।

আমি ওকে নিয়ে যেতে চাই সঙ্গে করে, যদি অনুমতি দাও তবে কালই চলে যাবো।

সে কি, হিন্দল তোমার ভাল লাগছে না?

যেখানে তুমি নেই সেখানে আমার একটুও মন টিকে না। বিশ্বাস কর বনহুর, এই দিনগুলো যে আমার কেমন করে কেটেছে আমি নিজেই জানি না। সব সময় শাপলাকে নিয়ে তোমার কথা ভুলে থাকতে চেয়েছি, তবুও.... একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আশার বুক চিরে।

বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়েছে, সে নতদৃষ্টি তুলে তাকায় একবার আশার মুখের দিকে।

আশা কিছু না বলে বেরিয়ে যায়।

বনহুর সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে। কতগুলো এলোমেলো চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আশা যে কথাগুলো এখন বলে গেল, সে কথাগুলো বেশি করে আলোড়ন সৃষ্টি করে তার মনে ... বিশ্বাস কর বনহুর, এ দিনগুলো যে আমার কেমন করে কেটেছে, আমি নিজেই জানি না। সব সময় শাপলাকে নিয়ে তোমার কথা ভুলে থাকতে চেয়েছি, তবুও .... আশার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি হতে থাকে তার কানের কাছে।

বনহুর একটির পর একটি সিগারেট নিঃশেষ করে চলে। শুধু আশাই নয়, ভেসে উঠে কয়েকটা নারীমুখ তার মনের পর্দায় যারা তাকে মনে প্রাণে ভালবেসেছিল কিন্তু প্রতিদানে সে তাদের কিছু দিতে পারেনি। কয়েকটি মুখ হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে, যেমন সিন্ধিরাণী সাগরতলে তাকে রক্ষা

করেছিল নানাভাবে, ভালবেসেছিল সে মনপ্রাণ দিয়ে কিন্তু বনহুর প্রতিদানে তাকে ভালবাসা দিতে পারেনি। নিজের জীবন দিয়ে সিন্ধিরাণী তাকে রক্ষা করেছিল অজ্ঞাত শত্রুর কবল থেকে। মনে পড়ে লুসীর কথা, যে নিজের সতীত্ব বিলিয়ে দিয়ে তার জীবন বাঁচিয়েছিল, সেই লুসীকেও বনহুর হারিয়েছে, সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে লুসী চিরতরে। মনে পড়ে জংলীরাণীর মুখখানা—ফুলের মতই নিষ্পাপ ছিল সে, ভালবেসেছিল জংলীরাণী তাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, যে ভালবাসায় ছিল না কোন কলুষতা, সেই জংলীরাণীকেও বনহুর রক্ষা করতে পারেনি, চোরাবালি তাকে গ্রাস করেছে ...

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কক্ষে প্রবেশ করে লিয়াংলিচু, কুর্ণিশ জানিয়ে বলে সে— সর্দার।

বলো?

আশা দিদি চলে যাচ্ছে।

সেকি!

হাঁ, সে বলছে আজই সে চলে যাবে।

আচ্ছা যেতে দাও।

কিন্তু ...

বলো।

রহস্যময়ী নারীর কি হবে, তাকে আমরা তো সামলাতে পারবো না।

আচ্ছা আমি যাচ্ছি, চলো। বনহুর উঠে দাঁড়ায়। লিয়াং একপাশে সরে দাঁড়ায়।

বনহুর হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেটখানা মেঝেতে ফেলে বুট দিয়ে পিষে ফেলে, তারপর বেরিয়ে যায়।

আশা তার নিজ কক্ষে কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিচ্ছিলো, মুখমণ্ডল গম্ভীর, আষাঢ়ে আকাশের মত থমথমে।

বনহুর প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

ভারী বুটের শব্দে আশা বুঝতে পারল কক্ষে কে এসেছে, তাই সে মুখটা আরও নিচু করে নিল।

বনহুর ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, বললো সে— আশা, চলে যাচ্ছো?

আশা বললো— হাঁ।

আরও কিছুদিন থেকে গেলে হয় না?

না।

শাপলাকে ছেড়ে যাবে?

আশা নীরব রইল।

বনহুর বললো— তুমি চলে গেলে শাপলা আবার অমানুষ হয়ে পড়বে। আর কিছুদিন থেকে যাও আশা! শাপলাকে তার পিতার হাতে তুলে দেবার মত অবস্থা করে দাও! তুমি ছাড়া ওকে কেউ আর আয়ত্বে আনতে পারবে না....

না, আর আমি পারবো না।

কেন? অভিমান করছো আমার উপর?

তুমি আমার কে তাই তোমার উপর অভিমান করব? আমি অভিমান করিনি...

হেসে বললো বনহুর — যদি সত্যিই অভিমান না করে থাকো তবে আর কিছুদিন থেকে যাও আশা। একি, তুমি কাঁদছো? বনহুর আশার চিবুকটা উঁচু করে ধরে। আশা, তোমার চোখে পানি দেখবো এটা আমি আশা করিনি। তুমি অন্যান্য নারীর মত নও, এই আমি জানি। আশা, কথা দাও শাপলা যতদিন সম্পূর্ণ সভ্য না হবে ততদিন তুমি যাবে না? বলো, আমার এ অনুরোধটা রাখবে? কথা দাও আশা?

আশার গণ্ড বেয়ে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

বললো— বেশ, কথা দিলাম কিন্তু ...

বলো, থামলে কেন?

কিন্তু কথা দাও তুমি আবার আসবে— বলো? আশা বনহুরের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে।

বনহুর বলে— যদি খুশি হও আসবো। আশা, শাপলাকে সভ্য মানুষ তৈরি করেছ, এজন্য আমি যে কত আনন্দ পাচ্ছি, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

তোমার আনন্দই আমার জীবনের কামনা। বনহুর, তুমি খুশি হও আমি এই চাই.....

আশা !

বলো?

বড় অভিশপ্ত জীবন আমার!

না না, ও কথা তুমি বলো না, তোমার জীবন সে তো সুন্দর সার্থক অপূর্ব জীবন .... তুমি সবার কামনার বস্তু।

আশা!

হাঁ বনহুর, তুমি সবার স্বপ্নের জন, কামনার জন, সাধনার ব্যক্তি। আশা বেরিয়ে যায় সেই কক্ষ থেকে।

বনহুর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে থ' হয়ে, তারপর মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে তার ঠোঁটের কোণে।

❑

মোখলেছুর ভাই, ওরা চাল বোঝাই ট্রাক নিয়ে রাতের অন্ধকারে হিজলা সড়ক ধরে সীমান্তের ওপারে চলে যাবে। কাল সমস্ত দিন ধরে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে চাল এবং ধান কিনেছে। কথাগুলো বলে থামলো ঠাণ্ডা।

মোখলেছুর কোমরে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বললো— আমরা প্রস্তুত আছি। শিগ্‌গির শাজাহানকে ডেকে আনো ঠাণ্ডা। আমরা কিছুতেই এ মালামাল সীমান্তের ওপারে যেতে দেব না।

শাজাহান ভাই এসে গেছে।

এই তো আমি এসেছি মোখলেছুর, তোদের হয়েছে?

হাঁ, আমরা তৈরি। বললো মোখলেছুর।

সাতজন ওরা সবাই জমকালো পোশাকে তৈরি হয়ে নিয়েছে, সবার হাতেই এক একটা আগ্নেয়াস্ত্র।

এমন সময় শিরিন ট্রের উপর কতগুলো কাপ এবং একটি টি পটে গরম চা নিয়ে হাজির হলো। তার পিছনে জাহানারা, তার হাতে কিছু গরম সিঙ্গারা।

শিরিন বললো— নাও, তোমরা গরম চা খেয়ে নাও, তারপর যেখানে খুশি যাও।

জাহানারা সিঙ্গারার প্লেটখানা সবার সামনে বাড়িয়ে ধরলো —নাও, নিজের হাতে তৈরি করে এনেছি।

মোখলেছুর একটা সিঙ্গারা তুলে নিল, সঙ্গে সঙ্গে সবাই তুলে নিল এক একটা সিঙ্গারা, তারপর খেতে শুরু করলো।

এমন সময় শমসের আলী এলো সেখানে।

ছেলেদের পরনে জমকালো পোশাক দেখে এবং তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখে চমকে উঠলো সে। শমসের আলী এসেছিল সমিতি প্রাঙ্গণে। তার গরুটা গোয়াল থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিল এদিকে। শমসের আলী তাই গরু ধরতে এসেছিল, এসে দেখে সমিতি কক্ষের দরজা খোলা, তাই সে পা পা করে সমিতি কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে অবাক হয়ে যায় ছেলেদের অদ্ভুত ড্রেসে সজ্জিত অবস্থায় দেখে।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো শমসের আলী— একি, তোমরা এমনভাবে প্রস্তুত কেন?

মোখলেছুর বললো— অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে যাচ্ছি। দোয়া কর শমসের ভাই, যেন ট্রাক ভর্তি চাল ছিনিয়ে নিতে পারি এবং বিলিয়ে দিতে পারি দুঃস্থ জনগণের মধ্যে।

মোখলেছুরের কথায় শিউরে উঠে শমসের আলী, বলে— না না, ও কাজে তোমরা যেও না ভাই, আমি তোমাদের নিষেধ করছি।

না, কোন বাধাই আজ আমরা শুনবো না শমসের ভাই। আমরা কিছুতেই দেশের সম্পদ বাইরে যেতে দেব না। আমরা ছিনিয়ে নেবোই.....

কিন্তু এমনভাবে ছিনিয়ে নেওয়া উচিত হবে না।

কেন উচিত হবে না? আমরা বারবার ইকরাম আলীকে ও তার দলবলকে সাবধান করে দিয়েছি তবু তারা অন্যায় করে যাচ্ছে। দেশে এত শস্য উৎপন্ন হয়েও দেশের মানুষ যদি অনাহারে মরে, তা কিছুতেই আমরা বরদাস্ত করব না।

তা তো বুঝি কিন্তু তোমরা কি পারবে ঐ নরপশুদের সঙ্গে? ওরাই যে গ্রামের শাসনকর্তা। ওদের কথায় সবাই ওঠে বসে— সব কাজ করে।

তা হতে দেব না। ওরা যদি অন্যায় কাজ করে আমরা নীরবে সহ্য করব? শমসের ভাই, তোমরা চিরদিন মুখ বুজে সহ্য করেছ— আর নয়, আমরা অন্যায় সহ্য করব না, করব না.... টেবিলে মুষ্ঠাঘাত করে ঠাণ্ডা।

মোখলেছুর বলে উঠে— যতই তোমরা মুখ বুজে সহ্য করে এসেছো ততই ওরা তোমাদের নেড়ে মাথায় বেল ভেঙ্গে খেয়েছে।

শমসের আলী সরল সোজা মানুষ, সে বলে উঠে— ওরা যা করে সরকারের নির্দেশমত করে। দোষ ওদের নেই, বুঝলে ভাই?

দেখো শমসের ভাই, তোমাদের বয়স হয়েছে, তোমরা আমাদের চেয়ে ভাল বোঝো মানি, কিন্তু তোমরা নীরবে অন্যায় হজম করতেও জান। সরকারের দোহাই দিয়ে কেউ অন্যায় করুক, এটা আমরা সহ্য করব না। তুমি যাও, নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও গে। মোখলেছুর শমসের আলীকে বিদায় করে দেয়।

এখানে যখন সমিতির গোপন এক কক্ষে যুবক ছেলেরা চোরামালবাহী ট্রাক ছিনিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, তখন ইকরাম আলীর শয়নকক্ষে হবি মোল্লা সহ আরও দু'জন রাইফেলে গুলী ভরে নিচ্ছিল।

ইকরাম আলী বললো— হবি, তুমি যা বললে সব সত্যি তো?

একেবারে খাঁটি সত্য, আমি নিজের চোখে দেখেছি, নিজের কানে শুনেছি— ট্রাক যখন হিজলা সড়ক হয়ে সীমান্তের ওপারে যাবার জন্য এগুবে তখন ওরা ট্রাকগুলো আটক করে সব মালামাল ছিনিয়ে নেবে।

আমি জীবিত থাকতে এ হতে দেব না। হবি, রমজান, শের আলী, তোমরা তৈরি আছো?

জ্বি হাঁ, আমরা তৈরি। বললো শের আলী।

ইকরাম আলী বললো— দুষ্কৃতিকারীদের কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় আমার জানা আছে। গ্রামের শিক্ষিত ছেলে হয়ে তারা এসেছে আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে। শের আলী?

বলুন জনাব?

তোমাদের রাইফেলের গুলী যেন ব্যর্থ না হয়, ওদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়া চাই।

জনাব, হাত আমাদের পাকা আছে।

বারবার ওদের বাপদের সাবধান করে দিয়েছি, তবু ছেলেগুলোকে সৎপথে আনতে পারল না। এবার বোঝাবো কেমন মজাটা! আমারই জমিতে বাস করে, আমারই জমি চাষ করে, আমারই কাজে বাধা.... দাঁতে দাঁত পিষে বলে ইকরাম আলী।

হবি মোল্লা বলে উঠে— আর দেরী করা উচিত হবে না।

ইকরাম আলী বলে— নাও, আমার বন্দুকটা তুমি নাও হবি। যাও, এখন ট্রাকগুলো ছাড়বে। ওগুলো হাটের পথে বটতলায় অপেক্ষা করছে।

শোন, ট্রাকের মধ্যে তোমরা গোপনে লুকিয়ে থাকবে, আমি হিজলা সড়কে লাঠিয়ালদের নিয়ে লুকিয়ে থাকবো, সময়মত হাজির হব, বুঝলে?

বুঝেছি। বললো হবি মোল্লা।

ওরা বেরিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে।

হাটের পাশে বটতলায় দাঁড়িয়েছিল চাল আর ধান বোঝাই দুটি ট্রাক। ইকরাম আলীর লোক বন্দুক আর রাইফেল নিয়ে ট্রাকের ভিতরে চাল আর ধানের বস্তার ফাঁকে লুকিয়ে পড়লো।

ট্রাকের ড্রাইভার এতক্ষণ প্রস্তুত হয়েই বসেছিল। ওরা উঠে বসতেই ট্রাক ছাড়লো।

আজ নতুন নয়, এ পথে প্রায়ই ধান এবং চাল বোঝাই ট্রাক নিয়ে ওরা যাওয়া-আসা করে। কোনদিন কেউ বাধা দেয় না। সেবার নৌকায় ডাকাত পড়েছিল, ডাকাত নিজে কিছু নেয়নি, তবে সব বিলিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। তারপর আর তেমন কিছু ঘটেনি। ড্রাইভারগণ তাই চরম সাহসী হয়ে উঠেছে। চোরা মাল বহনকারী ট্রাকের ড্রাইভার হওয়া চরম ভাগ্যের কথা, মোটা অর্থ উপার্জন হয়। কাজেই ড্রাইভারগণ বেশ পাকা বলেই মনে হলো।

গাড়ি দু'টো চলেছে।

চাল আর ধানের বস্তার আড়ালে ক্ষুব্ধ শার্দুলের মত বসে আছে ক'জন নরপশু, যেমন ওৎ পেতে থাকে বন্যশূকর ঠিক তেমনি করে।

ওদিকে মোখলেছুর দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছে একটি ঝোপের আড়ালে। গাড়ির শব্দ তাদের কর্ণগোচর হচ্ছে। মোখলেছুর রাজুকে লক্ষ্য করে বললো— রাজু, আমি গাড়ির চাকায় গুলী করব, তুই ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ির সম্মুখে পথ রোধ করে দাঁড়াবি, সাথে সাথে আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বো।

রাজু বললো— তোমাকে বলতে হবে না মোখলেছুর ভাই, আমি কিছুতেই গাড়ি দুটো এগুতে দেব না।

বললো মোখলেছুর—সাবাস, তাই চাই রাজু!

কর্তব্যপরায়ণ নিষ্ঠাবান যুবক রাজুর চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলে উঠলো যেন।

গাড়ি দুটো তীব্র আলো ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

ঐ তো আর বেশি দূরে নেই, এই এসে পড়লো বলে। যেমনি প্রথম গাড়ি লক্ষ্যের মধ্যে এসেছে, অমনি মোখলেছুরের রাইফেল গর্জে উঠলো, সাথে সাথে পরপর আরও কয়েকটা। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানার চাকা ফেঁসে গেল।

রাজু ততক্ষণে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

মোখলেছুরের দল জানতো না চাল আর ধানের বস্তার আড়ালে অস্ত্র নিয়ে ওৎ পেতে বসে আছে কয়েকজন নর শয়তান।

দু'তরফ থেকে গুলী বিনিময় শুরু হলো।

শের আলীর গুলী গিয়ে বিদ্ধ হলো রাজুর বুকে।

একটা আর্তনাদ নিকষ অন্ধকারের বুক চিরে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

কেঁপে উঠলো মোখলেছুর ও তার দলবলের হৃদয়— এ যে রাজুর কণ্ঠস্বর! সবাই গাড়ির সম্মুখে ছুটলো, গাড়ির আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেল রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে আছে রাজু।

ছেলেরা ভুলে গেল সব কথা, তারা রাজুর রক্তাক্ত দেহের পাশে এসে ঝুঁকে পড়লো।

ইকরাম আলী একদল লাঠিয়াল সহ পথের ধারে গোপনে লুকিয়েছিল, সে লাঠিয়ালদের নির্দেশ দিল সবাইকে লাঠিপেটা করতে ....

মোখলেছুরের দল প্রস্তুত ছিল না, তারা বন্ধুর মৃত্যুর দৃশ্য সহ্য করতে পারছিল না। এমন সময় লাঠিয়ালদের লাঠির আঘাত এসে পড়লো। রাজু ও আরও একজন নিহত হলো, আর সবাই আহত— অবশিষ্টগুলো হলো বন্দী।

পরদিন ইকরাম আলী পুলিশ বাহিনীকে ডেকে সবাইকে তুলে দিল তাদের হাতে। পুলিশ মহলকে সে জানালো, চাল ও ধান বোঝাই গাড়িতে হানা দেয়ার জন্য দুষ্কৃতিকারীদের, তাদের লাঠিয়াল পাকড়াও করেছে এবং দু'জনকে তারা নিহত করতে সক্ষম হয়েছে।

পুলিশ মহল মোখলেছুরের দলকে গ্রেফতার করে নিয়ে চলে গেল।

পরদিন সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রচার হলো— হাজরা গ্রামে ডাকাতির দায়ে পাঁচ জন যুবক গ্রেফতার এবং দুজন গ্রামবাসী লাঠির আঘাতে নিহত। ডাকাতদলের নেতা মোখলেছুরকেও পুলিশ বাহিনী গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।

বনহুরের কানে গিয়ে পৌঁছে সংবাদটা।

এ সংবাদে বনহুর স্থির থাকতে পারল না, সে তখনই রহমানকে ডেকে বললো— রহমান, আমি জানতে পারলাম হাজরা গ্রামে নানা রকম অন্যায় অনাচার চরমে উঠেছে। আমাকে দু'একদিনের মধ্যেই হাজরা অভিমুখে রওনা দিতে হবে।

সর্দার, আপনি কান্দাই চৌধুরী বাড়ি গিয়েছিলো?

সময় করে উঠতে পারিনি, হিন্দল থেকে ফিরে যাবো মনে করেছিলাম, কিন্তু ...

সর্দার, আমি গিয়েছিলাম— বৌরাণীর শরীর ভাল নয়, নূর বিদেশ যাওয়ার পর থেকে তাঁর মনের অবস্থা খুব খারাপ।

যাওয়া নিতান্ত দরকার তবু পারছি না, কারণ হাজারায় আমার যেতেই হবে। রহমান, তাজকে প্রস্তুত কর, আমি আজই রওনা দেব। বনহুর কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ালো, রহমান তাকিয়ে দেখলো সর্দারের মুখমণ্ডল কঠিন আকার ধারণ করেছে।

রহমান ঐ মুহূর্তে কিছু বলার সাহস পেল না, সে কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

বনহুর সিগারেট ধরালো, পায়চারী করতে করতে সিগারেট থেকে ধূঁয়া নির্গত করে চললো। একটা গভীর দুশ্চিন্তার ছায়া ফুটে উঠলো তার মুখমণ্ডলে।

কিছু পরে ফিরে এলো রহমান— সর্দার তাজ প্রস্তুত।

বনহুর সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করে ফিরে তাকালো রহমানের দিকে— রহমান, তুমিও দুলকীকে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নাও, তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে।

রহমান বললো— আচ্ছা সর্দার।

রহমান বেরিয়ে যেতেই কক্ষে প্রবেশ করে নূরী— কোথায় যাচ্ছো অসময়ে?

অসময় কাকে বলে নূরী?

এই তো সবে হিন্দল থেকে ফিরে এলে— দু'একটা দিন বিশ্রাম করবে না?

বিশ্রাম! বিশ্রাম যে আমার জন্য নয় নূরী, এ কথা তুমি তো জান।

হাজরায় এত জরুরি যাবার কি প্রয়োজন শুনি?

তুমি বুঝবে না নূরী, ফিরে এসে সব বলবো।

বনহুর কথাটা বলে তৈরি হয়ে নেবার জন্য পাশের কক্ষে চলে গেল।

❑

শহর থেকে বড় সাহেব এসেছেন, তাঁর হাতেই আমার সবকিছু— মান-সম্মান ইজ্জত। তিনি যা বলবেন তাই হবে। এই যে মালামাল আসছে— সব ঐ মহান ব্যক্তির দয়ায়, বুঝলে হাবলুর মা? কথাগুলো চাপাস্বরে বললো ইকরাম আলী স্ত্রীর কাছে।

হাবলুর মা পান সাজছিল, সে এক খিলি পান স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বললো— তাই বলে তুমি নিজের ছেলের বৌকে....

চুপ কর.... ছেলের বৌ! ছেলেই তোমার হাবা-কালা-বোবা —বৌকে নিয়ে ও সংসার করেছে কোনদিন? গোলাপী আছে আমার বাড়িতে ঝি-চাকরের মত।

তুমি কি বলছো?

বলছি খাওয়া-দাওয়া হয়েই গেছে। উনি বিশ্রাম করছেন, গোলাপী পান নিয়ে যাক ঐ ঘরে। বড় সাহেব সৌখিন মানুষ, গোলাপীকে সেদিন দেখেছিল এক নজর, বড় পছন্দ হয়েছে ওকে।

কি জানি আমার কিন্তু ওসব ভাল লাগে না।

তোমার তা লাগবে কেন? যত মাথা ব্যথা আমার। জান হাবলুর মা, এত বিষয় সম্পত্তি আমার কি করে হলো? শহরের বড় সাহেবদের দয়ায়, বুঝলে? সেই মহান ব্যক্তিরা যদি আমার বাড়ি থেকে বিমুখ হয়ে চলে যান তাহলে... যাও গোলাপীকে চুল আঁচড়ে একখানা পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে দাও, তারপর রেকাবিতে কয়েক খিলি পানসহ বড় সাহেবের ঘরে পাঠিয়ে দাও।

যাচ্ছিগো যাচ্ছি— আগে হাবলু ঘুমিয়ে পড়ুক।

ওর জন্য ভাবতে হবে না, ও ওসব কি বোঝে?

যাও, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি—বলে ইকরাম গৃহিনী গোলাপীর কক্ষের দিকে চলে যায়।

ইকরাম আলী এসে দাঁড়ায় উঠানের মাঝখানে।

গোলাপীর কক্ষ থেকে ভেসে আসে গোলাপীর কণ্ঠস্বর —না, আমি যাবো না।

থমথমে অন্ধকার রাত।

নিস্তব্ধ বাড়িখানায় গোলাপীর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যায়। ইকরাম আলী রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করে, চাপাকণ্ঠে বলে— ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমার মান-সম্মান সব খোয়া গেল। বড় সাহেবের কানে গিয়ে পৌঁছলো বুঝি গোলাপীর কথাগুলো — ছি ঃ ছিঃ ছি ঃ....

গম্ভীর গলায় ডাকলেন— হাবলুর মা— ও হাবলুর মা, শোন! ওকে টেনে বের করে নিয়ে এসো...

স্বামীর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল ইকরাম গৃহিণী। সে পুত্রবধূকে শাসনের সুরে বললো— শিগ্‌গির চলো, নাহলে টেনে বের করে নিয়ে যাবো বলে দিলাম।

গোলাপী খাটের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো স্থবিরের মত। এই তার নতুন নয়, এমনি অনেকবার তাকে অনেক বড় সাহেবের পাশে যেতে হয়েছে— নানারকম উৎকট উক্তি তাকে শুনতে হয়েছে। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তবু সেই সময় তার পাশে আরও কয়েকজন ছিল। আজ গভীর রাতে বড় সাহেবের ঘরে তাকে একা যেতে হবে .... না না না, সে কিছুতেই যাবে না, কিছুতেই না।

গোলাপী বলে উঠলো— আমাকে তোমরা জবাই কর— তবু আমি যাবো না...

কি বললে? ইকরাম গৃহিণী খেঁকিয়ে উঠলো।

গোলাপীর কণ্ঠে যেন আজ অসীম সাহস দেখা গেল। সে প্রতিবাদের সুরে বললো— আমি এই রাতদুপুরে কিছুতেই বাইরে যাবো না।

কি, এত সাহস তোমার? আমার মুখের উপর এতবড় কথা বলতে পারলে! ইকরাম গৃহিণীর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

গোলাপীর কথাগুলো তার কানে সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হলো, কারণ এর পূর্বে এমন সুর তার কণ্ঠে কোনদিন শোনেনি সে।

রাগে-ক্ষোভে ইকরাম গৃহিণী উন্মুখ হয়ে উঠলো যেন, সে বজ্র মুষ্ঠিতে চেপে ধরলো গোলাপীর হাত—চলো, যেতেই হবে তোমাকে।

না, আমাকে এমন করে নিয়ে যেও না মা, আমাকে এমন করে টেনে নিয়ে যেও না। আমি এত রাতে বাইরের ঘরে যাবো না, যাবো না...... গোলাপী খাটের হাতল চেপে ধরলো শক্ত করে।

বললো ইকরাম গৃহিণী— তোকে না নিয়ে গিয়ে ছাড়বো না। চল হারামী মেয়ে, চল্ শিগগির...

মা— মাগো, আমাকে নিয়ে যেও না..... যেও না, ছেড়ে দাও.... ছেড়ে দাও ...

ততক্ষণে গোলাপীকে টেনে বের করে আনে ইকরাম গৃহিণী ঘর থেকে বাইরে।

উঠানে উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইকরাম আলী, তার মুখখানা তখন সম্পূর্ণ দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে, ভীষণ রেগে গেছে সে।

বৈঠকখানার ঘরে বড় সাহেব ধূর্ত শিয়ালের মত ওৎ পেতে বসে বসে সিগারেট পান করছে। তার ধমনির রক্ত তখন উষ্ণ হয়ে উঠেছে। গোলাপীকে ইতিপূর্বে সে কয়েকবার দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে কিন্তু একেবারে এমন নির্জন রাতে সঙ্গিনী হিসাবে তাকে কাছে পায়নি কোনদিন। বড় সাহেব এত ঘন ঘন হাজরা গ্রামে আসে শুধু ঐ একটিমাত্র কারণে, গোলাপীর যৌবন সুধা পান করার নেশা তাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাই সে নেশাগ্রস্তের মত কাজে অকাজে হাজরায় ধন্না দিতে শুরু করে দিয়েছে।

ইকরাম আলী বড় সাহেবের মনোভাব আঁচ করে নিয়েই গোলাপীকে টোপ ফেলে কার্যসিদ্ধি করে চলেছে। বড় সাহেবও এ সুযোগ অবহেলা করে না। সে কক্ষমধ্যে বসে সব কথাই শুনতে পাচ্ছিলো। তার মনে একটা লোভাতুর ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল বারবার, যেমন ভাঁজা মাছের গন্ধে বিড়াল মামার অবস্থা হয় ঠিক তেমনি।

ওদিকে গোলাপীকে নিয়ে তখন শাশুড়ি আর শ্বশুর মিলে টানা-হেঁচড়া শুরু হয়ে গেছে।

ঘর থেকে উঠানে নামিয়ে আনা হয়েছে গোলাপীকে।

ইকরাম আলী বললো— আজ যদি আমাদের কথা না শোন, তাহলে কালকেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

গোলাপী তখনও বলে চলেছে— না না, আমাকে এত রাতে ও ঘরে নিয়ে যাবেন না আপনারা.... নিয়ে যাবেন না, নিয়ে যাবেন না....

গোলাপীর কাতর কণ্ঠে বিচলিত হয় না ইকরাম দম্পত্তি। তারা জোরপূর্বক পুত্রবধূকে নিয়ে হাজির হয় বৈঠকখানার দরজায়।

বড় সাহেব তখন দরজার আড়ালে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে মুখখানা হুতুম পেঁচার মত গম্ভীর করে। বুকের মধ্যে সুড়সুড়ি ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। মনের ভাবকে সে অনেক কষ্টে দমন করে আসছে যেন।

নরশয়তান ইকরাম আলী ততক্ষণে গোলাপীকে নিয়ে এসে হাজির হলো বৈঠকখানার দরজায়। প্রায় একরকম ধাক্কা দিয়েই ওকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দরজার শিকল টেনে দিল সে। বড় সাহেব খপ্ করে ধরে ফেলেন গোলাপীর একখানা হাত—যেমন করে শিকারী বিড়াল ইঁদুরছানাকে ধরে ফেলে তেমনি করে।

গোলাপী তখন একেবারে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। তার কণ্ঠ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না। শুধু থরথর করে সে কাঁপছে। বড় সাহেব গোলাপীর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেন বিছানার দিকে। তার মুখে একটা কুৎসিত লালসাপূর্ণ হাসির আভাস ফুটে উঠেছে।

গোলাপীকে বিছানার পাশে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো বড় সাহেব।

অসহায় কণ্ঠে বললো, গোলাপী— খোদা আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও ...

বড় সাহেব বললো— আমি বাঘ না ভল্লুক তাই ভয় পাচ্ছো সুন্দরী? এসো, আমার বহুবন্ধনে এসো।

না না, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও .... খোদা, হে খোদা, আমাকে বাঁচাও ....

কিন্তু বড় সাহেব তখন উন্মত্তের মত গোলাপীকে বুকে টেনে নিয়ে নিজের মুখখানাকে তার মুখের উপর চেপে ধরলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে পিছনের জানালা কেঁপে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলো এক জমকালো মূর্তি।

চমকে ফিরে তাকালো বড় সাহেব। মুখমণ্ডল তার ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। গোলাপীকে মুক্ত করে দিয়ে বললো— কে তুমি?

জমকালো মূর্তির দক্ষিণ হাতে রিভলবার, পায়ে ভারী বুট। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলো সে বড় সাহেবের পাশে।

গোলাপী তখন ভয়বিহ্বল চোখে বিবর্ণমুখে তাকিয়ে আছে জমকালো মূর্তিটার দিকে। তার মনেও প্রশ্ন— কে এই জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি? টুশব্দও সে উচ্চারণ করছে না। গোলাপীর সুন্দর মুখখানা নীল হয়ে উঠেছে যেন।

জমকালো মূর্তি কয়েক পা অগ্রসর হয়েই বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলো বড় সাহেবের জামার কলার। তারপর রিভলবার চেপে ধরলো তার বুকে, কঠিন স্বরে বললো— একটা অসহায় মেয়ের ইজ্জত লুটে নিতে লজ্জা করছে না বড় সাহেব? জান, তোমারও মা-বোন আছে— তাদের ইজ্জত যদি কেউ এমনিভাবে লুটে নেয় তাহলে কেমন হবে?

কে তুমি?

আমি মানুষ।

তুমি! তুমি খুন করতে চাও নাকি আমাকে?

হাঃ হাঃ হাঃ, খুন করতে চাইবো আমি আপনার মত মহৎ মহান ব্যক্তিকে? তোমাকে ফুল দিয়ে পূজা করব, নরপশু শয়তান.......

কথা শেষ হয় না জমকালো মূর্তির। সম্মুখ দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে ইকরাম আলী। সে গোলাপীকে বড় সাহেবের হাতে দিয়ে ফিরে গিয়েছিল নিজ কক্ষে। শয্যায় গা এলিয়ে দিতেই তার কানে পৌঁছলো জমকালো মূর্তির কণ্ঠের অদ্ভুত হাসির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো একরাম আলী উঠানে। কান পেতে বললো—হাবলুর মা, এ হাসির শব্দ বড় সাহেবের নয়।

ইকরাম গৃহিণীও কান পেতে শুনছিল, বলে উঠে— তাই তো এ গলার আওয়াজ তোমার বড় সাহেবের নয়....

ইকরাম আলী তক্ষুণি ছুটলো বৈঠকখানা অভিমুখে। কক্ষের দরজা অর্ধ ভেজান ছিল। সে দরজা ঠেলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়ালো, তার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। সে প্রথমে হতভম্ব হলেও পরমুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠে এবং চিৎকার শুরু করলো— ডাকাত ..... ডাকাত....

মাত্র কয়েকটা শব্দ সে উচ্চারণ করতেই জমকালো মূর্তির রিভলবারের গুলী বড় সাহেবের বক্ষ ভেদ করে আলগোছে বেরিয়ে গেল। একটা তীব্র

আর্তনাদ ফুটে উঠলো সেই কক্ষে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল বড় সাহেব, তাজা রক্তের বন্যা ছুটলো মেঝেতে।

জমকালো মূর্তির রিভলবারের গুলী বড় সাহেবের বক্ষ ভেদ করতেই ইকরাম আলী পিছু হটে পালাতে যাচ্ছিলো।

জমকালো মূর্তি তার ডান হাতখানা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে আর্তচীৎকার করে উঠলো— ইকরাম আলী এবং বাম হাতে ডান হাতের বাজু চেপে ধরলো।

জমকালো মূর্তি মুহূর্ত বিলম্ব না করে গোলাপীকে তুলে নিল কাঁধে, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল পিছনের জানালা দিয়ে কক্ষের বাইরে।

গোলাপী একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার চোখের সম্মুখে এমন খুন, এত রক্ত সে কোনদিন দেখেনি। জমকালো মূর্তি যখন গোলাপীকে ধরে ফেললো তখন সে একটু শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না, সংজ্ঞাহীনার মত চুপ ছিল সে।

জমকালো মূর্তি গোলাপীকে নিয়ে পিছন জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে!

বাইরে তখন জমাট অন্ধকার।

কক্ষমধ্য থেকে ইকরাম আলীর কাতর আর্তকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে— বাঁচাও, কে কোথায় আছো বাঁচাও আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে, বাঁচাও ....

পরমুহূর্তেই শোনা যায় ইকরাম গৃহিণীর ভয়ার্ত চিৎকার— ওরে কে আছো, বাঁচাও বাঁচাও, খুন হয়েছে, খুন হয়েছে ....

ইকরাম গৃহিণী গুলীর শব্দ শুনতে পেয়ে নিজ কক্ষ থেকে ছুটে এসেছিল, বৈঠকখানায় প্রবেশ করতেই দেখতে পায় মাটিতে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে বড় সাহেব, তারপর স্বামীর দেহ রক্তাক্ত। সে বাম হাতে ডান হাতের বাজু চেপে ধরে মাতালের মত টলছে। ইকরাম গৃহিণী এ দৃশ্য লক্ষ্য করে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল— একি কাণ্ড, সে যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। একটু সামলে নিয়েই চিৎকার শুরু করলো সে।

ইকরাম গৃহিণীর আর্তচিৎকারে ছুটে এলো পাড়া প্রতিবেশি। সবাই উঠানে ভিড় জমিয়ে ফেললো অল্পক্ষণেই। ইকরাম গৃহিণী বললো— দেখে যাও, ভিতরে এসে দেখে যাও কি সর্বনাশ আমার হয়েছে... তোমরা দেখে যাও ...

সবাই ভিড় করে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলো।

বড় সাহেবের রক্তাক্ত দেহ লক্ষ্য করে ভীত আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সবাই। সকলের মুখই ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠলো, সবাই একবাক্যে বলে উঠে— খুন খুন খুন ....

অল্পক্ষণেই গ্রামবাসীতে ভরে উঠলো ইকরাম বাড়ি। অন্ধকার রাত, সবার হাতেই লণ্ঠন আর কেরোসিনের ডিবা। নানা জনের মুখে নানা ধরনের কথা।

ইকরাম আলীকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ইকরাম আলী আর্তকণ্ঠে বলছে— ডাকাত গোলাপী বৌকে নিতে এসেছিল, তখন বড় সাহেব আর আমি বাধা দেই, তাতেই সে বড় সাহেবকে খুন করে আর আমাকে আহত করে গোলাপীকে নিয়ে পালিয়েছে ...

ইকরাম গৃহিণী বলে, হায় হায়, আমি আগেই যদি জানতাম ঐ শয়তানীর ডাকাতের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তাহলে সাবধান থাকতাম আমরা। হায় হায়, কি সর্বনাশ সে আমাদের করলো। বড় সাহেব ওর জন্য খুন হলো। হাবলুর বাবার হাতখানা গেল। কি হবে ... মাথায় করাঘাত করে সে কাঁদতে লাগল।

পাড়া প্রতিবেশীরা এসে ঘিরে ধরলো ইকরাম গৃহিণীকে, এক একজন এক এক রকম কথা বলতে লাগল। সবার রাগ গিয়ে পড়ল গোলাপীর উপর। তারই জন্য এতবড় সর্বনাশ আজ হলো। গোলাপীর রূপই নাকি এই সর্বনাশের মূল।

কেউ ছুটলো শহর অভিমুখে পুলিশ অফিসে সংবাদ দিতে, কেউ ছুটলো ডাক্তারের বাড়িতে ডাক্তার ডাকতে।

ইকরাম আলীর দক্ষিণ হাতখানার হাড় গুড়ো হয়ে গেছে, ছিড়ে গেছে রগগুলো। রক্তের বন্যা ছুটেছে যেন।

ওদিকে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে বড় সাহেব। চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে তার বুকের পাশে। এখনও বড় সাহেবের চোখ দুটো মুদে যায়নি, কেমন যেন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে।

পাড়া প্রতিবেশীরা অনেকেই বলছে তারা নাকি অশ্বপদ শব্দ শুনতে পেয়েছে। গোলাপীকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে ডাকাত পালিয়ে গেছে, বুঝতে পারে সবাই।

❑

পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে এলো

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো জমকালো মূর্তি। এতক্ষণ একটানা অশ্ব চালনা করে এসেছে সে। সম্মুখে বসিয়ে নিয়েছিল জমকালো মূর্তি গোলাপীকে।

এবার নির্জন একস্থানে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে জমকালো মূর্তি নেমে দাঁড়িয়ে গোলাপী-বৌকে সে নামিয়ে নিল নিচে।

গোলাপীর মুখখানা বিবর্ণ ফ্যাকাশে, ঠিক মড়ার মুখের মত রক্তহীন। অসহায় করুণ তার চোখ দুটো, মুখে কোন কথা নেই, এমন কি চিৎকার করার শক্তিও যেন সে হারিয়ে ফেলে।

জমকালো মূর্তির পাগড়ির আঁচলে এখনও তার মুখের নিচের অংশ ঢাকা, এবার জমকালো মূর্তি নিজের মুখের আবরণ সরিয়ে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী বলে উঠে— আপনি, আপনি সেই লোক .... এতক্ষণে গোলাপীর রক্ত শূন্য মুখখানায় একরাশ রক্ত ছড়িয়ে পড়ল যেন, চোখ দুটো খুশিতে ভরে উঠলো তার।

বললো জমকালো মূর্তি — আমিই তোমার সেই বন্ধু!

নির্বাক দৃষ্টি মেলে অবাক হয়ে দেখতে লাগল গোলাপী ওকে, প্রাণভরে যেন সে ওকে দেখছে। ভুলে গেছে গোলাপী লজ্জা-শরমের কথা।

হেসে বললো জমকালো মূর্তি— কি দেখছো অমন করে?

আপনাকে! সত্যি আপনি যে এমন করে ঠিক ঐ মুহূর্তে আমাকে উদ্ধার করব ভাবতে পারিনি। খোদা আপনাকে পাঠিয়েছিল— নাহলে আমি সব হারাতাম .... গোলাপীর গলা বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। একটু থেমে বলে— জান, মালেক ভাই সেই যে চলে গেছে আর আসেনি। বড় ভাল লোক ছিল সে, বড় ভালবাসতো আমাকে। জান, সে চলে যাবার পর আমার আর কিছু ভালো লাগে না। মনে হয় আমার কেউ নেই .....

জমকালো মূর্তি বলে উঠে— যদি মালেক ভাইকে পাও খুশি হবে?

হাঁ, আমি খুব খুশি হব।

বেশ, আমি তোমাকে ঐ নরপশুর কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছি, এবার তোমার মালেক ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দেব।

আর আপনি?

আমি একজন খুনী ডাকাত, কাজেই পুলিশ আমাকে সর্বক্ষণ সন্ধান করে ফিরছে, আমি তো তোমার পাশে থাকতে পারি না।

কিন্তু আমি যে আপনাকে ছেড়ে দেব না আর। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন, যেখানে আপনার ঘর, আমি সেখানেই থাকবো।

আমার তো কোন ঘর নেই— আমি ডাকাত, আমি খুনী.... তুমি তো নিজের চোখেই তার প্রমাণ পেয়েছো, কাজেই ....

না, আমি কোন কথা শুনবো না, আপনাকে যখন পেয়েছি তখন কিছুতেই আপনাকে আমি ছাড়বো না।

তা হয় না।

কেন হয় না? আমি বহুদিন ধরে আপনার প্রতীক্ষা করছি। আপনি কোথা থেকে এসেছেন আবার কোথায় চলে গেছেন। কতদিন আমি মালেক ভাইকে বলেছি কিন্তু মালেক ভাই আপনার সন্ধান দিতে পারেনি। আপনি আজ আমাকে বড় সাহেবের হাত থেকে উদ্ধার করেছো। উনি বড় সাহেব নন, উনি নরশয়তান, জালেম.... রাগে গোলাপীর গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠে।

জমকালো মূর্তি বলে— বড় সাহেবের চেয়েও জালেম হলো তোমার শ্বশুর ইকরাম আলী। কারণ, তারই সহায়তায় বড় সাহেব প্রশ্রয় পেয়েছিল। তোমার উপর পাশবিক অত্যাচার চালাতেও সে পিছপা হয় নি।

এতই যদি জান তবে কেন আমার শ্বশুরকে আপনি হত্যা করলেন না?

এবার একটু হাসলো জমকালো মূর্তি তারপর বললো— হত্যা করে ঐ নরশয়তানকে রেহাই দেব না, তাই ওকে হত্যা করিনি— ওর শাস্তি তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করা। গোলাপী, ইকরাম আলী শুধু তোমার জীবনটাকেই ধ্বংস করেনি, ধ্বংস করেছে সে সমস্ত গ্রামবাসীর। হাজরার এমন কোন ব্যক্তি নেই যার সে ক্ষতি করে নি। আত্মীয়ের ক্ষতি করেছে আত্মীয়ের মুখোস পরে। পাড়া প্রতিবেশীর ক্ষতি করেছে প্রতিবেশীর দোহাই দিয়ে। বন্ধুর ক্ষতি করেছে পরম বন্ধু সেজে। এই নরপশুর শাস্তি মৃত্যু নয় ...

তবে, তবে কি করব তার?

জঘন্য নির্মমভাবে তাকে আমি হত্যা করব এবং সে কারণেই আমি তাকে জীবিত রেখেছি।

বিস্ময় নিয়ে তাকিয়েছিল গোলাপী ওর দিকে। কে এই ব্যক্তি যার কথাবার্তা, চালচলন স্বাভাবিক মানুষের মত নয়। কে এই লোক যাকে সে মাঝে মাঝে হাজরা গ্রামের সেই বটতলায় দেখেছিল, আবার কোথায় উবে যেতো, আর কতদিন দেখা যেতো না। ওকে একনজর দেখেই গোলাপী ভালবেসে ফেলেছিল— ভালবাসা নয়, পাগলিনীপ্রায় হয়ে পড়েছিল। কেন এত ভাল লেগেছিল সে নিজেই বুঝতে পারেনি। ওর কণ্ঠস্বর, ওর চোখ দুটো, ওর হাসি তাকে আকর্ষণ করেছিল ভীষণভাবে। সেই সুন্দর সুপুরুষ লোকটার আর একটা ভয়ঙ্কর রূপ ছিল তা জানতো না গোলাপী।

আজ যখন সে জমকালো পোশাক পরে, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে রুদ্র মূর্তি ধারণ করে বড় সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলো তখন গোলাপী ভাবতেও পারেনি এই ব্যক্তি তার সেই বন্ধু।

গোলাপী যখন নানা কথা ভাবছে তখন জমকালো মূর্তি বলে উঠলো— হাজরা গ্রাম ছেড়ে আমরা বহুদূর এসে পড়েছি। ঐ যে সম্মুখে একটি গ্রাম দেখা যাচ্ছে, ঐ গ্রামেই আছে তোমার মালেক ভাইয়ের বাড়ি। যদি বলো ওখানে তোমাকে পৌঁছে দেব, থাকবে ওখানে।

বেশ তাই নিয়ে চলুন, আর কোনদিন আমি হাজরায় ফিরে যেতে চাই না।

সেখানে তোমার স্বামী আছে, সংসার আছে।

কে আমার স্বামী?

শুনেছিলাম ইকরাম আলীর পুত্র হাবলুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল?

হাঁ, কিন্তু আমি জানি আমি তার স্ত্রী না, সেও আমার স্বামী না, কারণ সে কোনদিন আমাকে স্পর্শ করেনি, আমিও কোনদিন তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করিনি।

তাহলে হাবলুর সংসার তুমি নিজের সংসার বলে মেনে নিতে চাও না?

না না না, আমি মরে যাবো তবু আর হাজরায় ফিরে যাবো না কোনদিন।

সত্যি?

হাঁ সত্যি।

চলো তবে, কিন্তু যাবার পূর্বে তোমাকে এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কারণ মালেক মিয়া বা তার আত্মীয় কেউ বাড়িতে আছে কিনা আমাকে জেনে আসতে হবে।

বেশ, আমি এখানে বসছি আপনি শীঘ্র ফিরে আসবেন। গোলাপী বসে পড়ল সেই স্থানে একটা উঁচু মাটির ঢেলার উপর।

জমকালো মূর্তি অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

গোলাপী নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

জমকালো মূর্তি বললো— খোদা হাফেজ। অশ্ব তারপর তাকে নিয়ে চলে গেল দ্রুতগতিতে।

❑

অজানা গ্রাম।

অশ্বপৃষ্ঠে এসে দাঁড়ালো বনহুর। অশ্বপৃষ্ঠ থেকেই সে লক্ষ্য করতে লাগল গ্রামখানাকে। এখনও ভোরের সূর্য প্রখর হয়ে উঠেনি। গ্রামবাসীরা সবে জেগে উঠেছে। অনেকে চলেছে মাঠের পথে লাঙ্গল কাঁধে।

বনহুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল এক বৃদ্ধ গরু নিয়ে মেঠো পথ ধরে এগুচ্ছে।

বনহুর অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো, লাগাম ধরে এগিয়ে গেল কিছুটা।

ততক্ষণে বৃদ্ধ গরু নিয়ে ঠিক সামনা-সামনি এসে পড়েছে।

বনহুর বললো— শোন বাবা!

এগিয়ে এলো বৃদ্ধ, বললো— আমাকে ডাকছো?

বনহুর বললো— হাঁ।

বৃদ্ধ ততক্ষণে গরুর দড়ি হাতের মুঠায় চেপে ধরে বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বনহুরকে দেখে বৃদ্ধ কিছুটা অবাক হয়েছে, কারণ সে ইতিপূর্বে তাকে কোনদিন দেখেনি, তাছাড়া বনহুরের জমকালো পোশাক তাকে আরও বিস্মিত করে তুলেছিল। বললো বৃদ্ধ আমাকে কিছু বলবে?

বনহুর বললো— হাঁ বলবো, আর বলবো বলেই তো তোমাকে ডেকেছি। আচ্ছা বাবা, এ গ্রামেই বুঝি তুমি থাকো?

হাঁ, এ গ্রামেই থাকি। ঐ যে বাড়িখানা দেখছো ওটাই আমার বাড়ি।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, গ্রামের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটা বাড়ি, ছোট্ট উঠানের পাশে পাশাপাশি দু'টি তালগাছ!

বললো বৃদ্ধ— ওখানে আমি থাকি।

তোমার ছেলেমেয়ে আছে?

না, কেউ নেই। আমার এক মেয়ে ছিল, সেও পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছে.... কণ্ঠ ধরে এলো বৃদ্ধের। চোখ দুটো গামছার আঁচলে মুছে নিয়ে বললো সে— ছেলেমেয়ে থাকলে আজ আমাকে খেটে খেতে হতো না।

বনহুর বললো— শোন বাবা, আমার একটা বোন আছে, তাকে যদি তোমার কাছে রাখি তাড়িয়ে দেবে নাতো?

বৃদ্ধ বললো— আমি নিজেই খেতে পাই না, তোমার বোনকে কি খাওয়াবো বলো? ওসব হবে না বাবা, পথ ছাড়ো আমি চলে যাই।

বললো বনহুর— যদি আমি আমার বোনের সঙ্গে তোমার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করি তাহলে রাজি আছো তাকে তোমার বাড়িতে আশ্রয় দিতে?

বনহুরের কথা শুনে খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো বৃদ্ধের চোখ দুটো, বললো— তোমার বোনের সঙ্গে আমারও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে, সত্যি বলছো?

হাঁ সত্যি। বনহুর কথাটা বলে প্যান্টের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে ধরে—নাও। রেখে দাও, আমার বোনকে তোমার কাছে রেখে যাবার পূর্বেই আমি তোমাকে এ টাকাগুলো দিলাম।

বৃদ্ধের চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠলো, তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না এত টাকা তাকে নেবার জন্য কেউ বলছে। সে ভাবছে, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো।

বৃদ্ধের হতভম্ব ভাব দেখে বললো বনহুর— ভয় নেই, নাও এ টাকা। বাড়ি ফিরে যাও, আর তোমাকে কাজ করে খেতে হবে না। বুড়ো মানুষ— বসে বসে খাবে বুঝলে?

বাবা, কে তুমি?

আমি যেই হই না কেন, আমার বোনকে তোমার বাড়িতে আশ্রয় দেবে, তাহলেই আমি খুশি হব এবং প্রয়োজনবোধে আরও টাকা দেব। নাও টাকা নিয়ে গোপনে রেখে দাও।

বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে টাকার বাণ্ডিল নিয়ে চাদরের নিচে লুকিয়ে ফেললো।

বনহুর বললো— শোন, একটা মিথ্যা কথা বলতে হবে আমার বোনের কাছে।

মিথ্যা কথা!

হাঁ। তুমি বলবে তোমার একটি ছেলে আছে, তার নাম মালেক মিয়া। আরও বলবে সে দূরে কোন জায়গায় চাকরি করে। শোন বাবা, মালেক মিয়া নামে কেউ যদি কোন সময় আসে তাকে নিজের ছেলের মত আদর-যত্ন কর। মালেক মিয়া হয়তো আসতেও পারে।

মালেক মিয়া! মালেক মিয়া তোমার কেউ হয় বুঝি?

হাঁ, আমার বড় ভাই। যাও, তুমি বাড়ি ফিরে যাও··· বনহুর কথাটা বলে চেপে বসে তাজের পিঠে।

বৃদ্ধ নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে, আজ সে কার মুখ দেখেই না উঠেছিল। কাপড়ের তলায় টাকার বাণ্ডিলগুলোর অস্তিত্ব ভাল করে অনুভব করে বৃদ্ধ।

ততক্ষণে তাজ প্রভুকে নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে।

❑

ফিরে আসে বনহুর গোলাপীর পাশে।

গোলাপী একা একা ঝিমিয়ে পড়েছিল, মনের মধ্যে একরাশ চিন্তা জট পাকাচ্ছিলো, ভাবছিল সে ···· ওকে বিশ্বাস কি ···· কতবার তো সে এসেছে, তাকে কথা দিয়ে চলে গেছে, পরে আর আসেনি ... এবারও যদি ও না আসে ···· তাহলে এই নির্জন প্রান্তরে সে একা একা কোথায় যাবে ···· এ পথ তার চেনা নয়। কেউ নেই তার যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে-যাবে।

ভাবছে গোলাপী এমন সময় শুনতে পায় ঘোড়ার খুরের শব্দ। আনন্দে বুকটা ওর ঢিব ঢিব করে উঠে। একটা খুশির উচ্ছলতা তার সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগায়। নতুন এক প্রভাত আজ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

উঠে দাঁড়ায় গোলাপী।

ততক্ষণে তাজের পিঠে বনহুর এসে দাঁড়ায় সেখানে।

গোলাপী বলে উঠে— এসেছেন তাহলে?

বনহুর অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলে— ভেবেছিলে আসবো না?

না, ঠিক তা ভাবিনি তবে ভয় হচ্ছিলো, কারণ আমি যে বড় হতভাগিনী...

বনহুর বললো— এসো, এবার তোমার সেই মালেক ভাইয়ের বাড়ি তোমাকে পৌছে দি।

মালেক ভাইয়ের বাড়ি আপনি খুঁজে পেয়েছেন বুঝি?

হাঁ।

বনহুর গোলাপীকে তাজের পিঠে তুলে নিয়ে সেও চেপে বসে।

তাজ ছুটতে শুরু করে এবার।

গোলাপীর মনে এখন পূর্বের সেই ভীতিকর ভাব নেই। সে এখন বুঝতে পেরেছে যে তাকে নিয়ে চলেছে সে তারই প্রিয়জন, তাই ওর মনে খুশির উৎসব। ইকরাম আলী আর বড় সাহেবের কবল থেকে সে উদ্ধার পেয়েছে। আর তাকে কোনদিন ফিরে যেতে হবে না ও বাড়িতে, এই তার বড় আনন্দ।

বনহুরের বুকে গোলাপী ঠেশ দিয়ে নিজকে আরও গভীরভাবে ওর সান্নিধ্যে নেয়। ওর প্রশস্ত বুকে বড় শান্তি, বড় তৃপ্তি, বড় আনন্দ।

কিছুক্ষণেই এসে পড়ে বনহুর সেই গ্রামখানার পাশে। আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সে— ঐ যে বাড়িখানা দেখছো, ওটাই হলো তোমার সেই মালেক ভাইয়ের বাড়ি।

গোলাপী তেমন খুশি হতে পারে না, কারণ সে জানে তাকে মালেক ভাইয়ের বাড়ি পৌছে দিয়েই চলে যাবে তার অজানা বন্ধু, তাই মনটা খুশি হতে পারে না যেন।

সেই বৃদ্ধের দরজায় এসে তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর, নামিয়ে ধরলো গোলাপীকে।

বৃদ্ধ দরজায় দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে এসে বললো— এসো মা, এসো।

গোলাপীকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর— চলো, ভিতরে চলো।

বনহুর আর গোলাপী বৃদ্ধের সঙ্গে উঠানে প্রবেশ করলো।

বৃদ্ধ দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে রেখেছিল, বললো —বসো বাবা, বসো তোমরা।

গোলাপী উঠানে প্রবেশ করেই এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো— মালেক ভাই কোথায় বুড়ো বাবা?

বৃদ্ধ অবাক হয়ে তাকাতেই বনহুর বললো— গোলাপী তোমার ছেলে মালেক মিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করছে।

বৃদ্ধের স্মরণ হলো বনহুরের পূর্বে শিখিয়ে দেয়া কথাগুলো। বললো বৃদ্ধ— ও আমার ছেলে মালেকের কথা বলছো বুঝি?

হাঁ। কোথায় মালেক ভাই? বললো গোলাপী।

বৃদ্ধ বললো— মালেক বাড়ি থাকে না, সে চাকরি করে শহরে। তবে মাঝে মাঝে আসে, যখন তার মন চায় তখন ....

বনহুর বলে— জান বাবা, গোলাপী মালেক ভাইকে বড় ভালবাসে, তাই সে ওর খোঁজ করছে।

বললো বৃদ্ধ— এসো মা, এবার বাড়ির ভিতরে এসো।

বনহুর বললো— যাও গোলাপী, তুমি এখানেই থাকবে। কোন অসুবিধা হবে না তোমার।

আপনি আসবেন না?

যখন মনে করব তখনই আসবো, দেখে যাবো তোমাকে। আমি তাহলে, কেমন?

অস্ফুট কণ্ঠে বললো গোলাপী— আসবেন কিন্তু, নাহলে আমি থাকতে পারবো না এখানে।

আসবো! কথাটা উচ্চারণ করে বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসলো।

যতক্ষণ বনহুরকে দেখা গেল ততক্ষণ নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইলো গোলাপী সেদিকে।

বৃদ্ধ হাকিম উল্লাহও দাঁড়িয়ে রইলো তার পাশে।

গোলাপী ফিরে তাকাতেই বৃদ্ধ হাকিম উল্লাহ বললো— মা আমার কেউ নেই, তুমি আজ থেকে আমার মেয়ে হয়ে এলে। তুমি আমার সংসারের লক্ষ্মী.... চলো মা, ভিতরে চলো।

গোলাপী তাকিয়ে দেখলো বৃদ্ধের মুখে মায়া-মমতার ছায়া ফুটে উঠেছে, গভীর স্নেহের পরশে চোখ দুটো ছল ছল করছে। বললো গোলাপী—চলো বাবা।

❑

শহর থেকে পুলিশ অফিসার এলেন। সঙ্গে এলো পুলিশ ফোর্স। বড় সাহেবের হত্যার ব্যাপার নিয়ে সমস্ত শহর এবং গ্রামাঞ্চলে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিল।

ইকরাম আলীর বাড়ি আজ লোকে লোকারণ্য। পুলিশের লোকজন আর গ্রামবাসীতে বাড়ি গম গম করছে। কে সে ডাকাত যার এমন দুঃসাহস বড় সাহেবকে হত্যা করেছে এবং গ্রামের মাতব্বর ইকরাম আলীকে আহত করেছে। গ্রামবাসীদের নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল পুলিশ অফিসার।

ডাক্তার এসেছেন— তিনি ইকরাম আলীর হাত পরীক্ষা করে বললেন, হাতখানা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়েছে, হাতখানা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। ইকরাম আলীকে তাই শহরে নিয়ে যাবার আয়োজন চললো।

ইকরাম গৃহিণী মাথায় করাঘাত করে কান্না জুড়ে দিয়েছে— তার রাগ ঐ গোলাপীর উপর। গোলাপীকে নিতে এসেই তো ডাকাত বড় সাহেবকে হত্যা করেছে, আহত করেছে তার স্বামী দেবতাকে।

পুলিশ প্রধানের কাছে একরাম আলী বললো— আমার পুত্রবধূ বড় অসৎচরিত্রা মেয়ে ছিল। সে আমার ছেলে হাবলুকে মোটেই পছন্দ করত না। গোপনে সে কোন এক ডাকাতের সঙ্গে প্রেম করত, সেই ডাকাত ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার তার বাড়িতে হানা দিয়েছিল, তখন গোলাপীকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারেনি। এবার সে গোলাপীকে যখন নিয়ে পালাতে যাচ্ছিলো তখন বড় সাহেব এবং আমি নিজে ডাকাতকে বাধা দিতে এগিয়ে আসি। ডাকাত তখন তার আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে।

ইকরাম আলীর কথায় অবিশ্বাসের কিছু ছিল না। বড় সাহেব প্রায়ই নানা কাজে হাজরা গ্রামে আসতো এবং গ্রামের মাতব্বর বলে ইকরাম আলীর বাড়িতেই সে উঠতো, কাজেই পুলিশ অফিসার ইকরাম আলীর কথামতই ডায়রী করে নিল।

বড় সাহেবের লাশ শহরে নিয়ে যাওয়া হলো।

তার সঙ্গে একটি ভিন্ন গাড়িতে ইকরাম আলীকেও নিয়ে যাওয়া হলো হসপিটালে।

❑

হসপিটালের ৩ নং ক্যাবিনে ইকরাম আলীকে রাখা হয়েছে। এক্সরে করার পর ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী তার দক্ষিণ হাতখানা সম্পূর্ণ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। ইকরাম আলী যেন আধখানা হয়ে গেছে একেবারে।

তার চারপাশে সব সময় গ্রামবাসীদের ভিড় জমে আছে। কেউ বা ডাব-আনারস নিয়ে এসেছে, কেউ এসেছে আংগুর বেদানা নিয়ে, কেউ বা এসেছে মিষ্টি নিয়ে। ফলমূলের স্তূপ জমে উঠেছে ইকরাম আলীর শিয়রে। সবাই তাকে নানাভাবে সহানুভূতি জানাচ্ছে। অবশ্য যদিও সবার মনেই ইকরাম আলীর প্রতি প্রতিহিংসার জ্বালা, কারণ লোকটা যে চরম অসৎ ব্যক্তি তা কারও অজানা ছিল না, তবু গ্রামবাসী আসে সহানুভূতি জানাতে, কারণ যখন ইকরাম আলী সুস্থ হয়ে উঠবে তখন সে হিসাব করে দেখবে গ্রামবাসীদের কে কে গিয়েছিল তাকে সহানুভূতি দেখাতে এবং তারা কে কেমন মূল্যের দ্রব্য নিয়ে হাজির হয়েছিল। সব কথাই তার মনে থাকবে আর সেই রকম নজর নিয়েই দেখবে সে গ্রামবাসীদের। অবশ্য তার অনুচরদের প্রতি ছিল সে সজাগ।

গ্রামবাসীদের অনেকেই যেতো ভয়ে আর কিছুসংখ্যক যেতো স্বার্থ নিয়ে।

হাতখানা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর দু'দিন সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন রইলো ইকরাম আলী।

তৃতীয় দিনে জ্ঞান ফিরে এলো তার।

রাত তখন গভীর।

প্রথম কিছু বুঝতে পারল না, বুঝলো যখন ভালভাবে সংজ্ঞা হলো, দেখলো ডান হাতখানা তার নেই। চিৎকার করে ডাকলো —নার্স ... নার্স....

ছুটে এলো নার্স, সে পাশেই কোথাও ছিল।

ইকরাম আলী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো— আমার ডান হাত কি হলো?

নার্স বললো— ডাক্তার পরীক্ষা করে আপনার হাতখানা বাদ দিয়েছেন।

কেন আমার হাতখানা বাদ দিল তিনি? আমি সুস্থ হয়ে ডাক্তারের দেহ থেকে তার মাথাখানাকে বাদ দেব।

একরাম আলীর রাগ দেখে নার্সগণ ভয় পেয়ে গেল, তারা বহু রোগী দেখেছে কিন্তু এমন বদরাগী রোগী তারা দেখেনি।

ডাক্তার সব শুনে হাসলো মাত্র।

একদিন ইকরাম আলী সুস্থ হয়ে ফিরে এলো হাজরা গ্রামে। পূর্বের চেয়ে আরও জঘন্য মনোবৃত্তি হলো তার। কি করে পরের ধন-সম্পদ নিজের করে নেবে, সদা হলো তার এই চিন্তা।

হবু মোল্লা এখন সব সময় তার ডান হাতের কাজ করে।

ইকরাম আলী যখন গ্রামের মধ্যে যায় তখন হবু মোল্লা থাকে তার পিছনে পিছনে।

আবার চলে ইকরাম আলীর শয়তানী বরং পূর্বের চেয়ে দশ গুণ বেশি হয় তার অনাচার অবিচার।

বড় সাহেব মারা পড়ার পর বেশ কিছুদিন শহর থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তির আনাগোনা কমে যায়, তারা কোন কাজে এলেও এখন আর রাত্রি বাস করে না ইকরাম আলীর বাড়িতে, কাজ সেরে ঐদিনই ফিরে যায় শহরে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

আবার শুরু হয়েছে ইকরাম আলীর শোষণের পালা। আসছে প্রচুর টাকা, আসছে সম্পদ।

ইকরাম আলী স্ত্রীকে বলে— একখানা হাত না হয় গেছে তাতে কি আসে যায়! এখন আমার ধন-সম্পদ আরও বাড়ছে। লোকজন এখন আরও বেশি ভয়, সম্মান করে।

ইকরাম গৃহিণী তবু মাঝে মাঝে পুত্রবধুর কথা স্মরণ করে কিন্তু ইকরাম আলী ভুলেও গোলাপী নামটা মুখে আনে না কোনদিন। গোলাপী গেছে তার জন্য কোন আফসোস নেই তাঁর, তবে কোন কোন সময় ভাবে যে টোপ ফেলে সাহেব-সুহাবদের সে হাত করত, সেই টোপ তার হাত ফসকে চলে গেছে।

একদিন গভীর রাতে কোন এক চোরাকারবারীর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে ফিরছিল ইকরাম আলী হঠাৎ তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো সেই

জমকালো মূর্তি যে বড় সাহেবকে হত্যা করেছিল, আহত করেছিল ইকরাম আলীকে।

অশ্বপৃষ্ঠে জমকালো মূর্তিটিকে লক্ষ্য করে শিউরে উঠলো ইকরাম আলী। সঙ্গে তার দ্বিতীয় প্রাণী কেউ ছিল না, একাই ছড়ি হাতে ফিরছিল বাড়ি অভিমুখে।

জমকালো মূর্তি ইকরাম আলীর সম্মুখে নেমে দাঁড়ালো, দক্ষিণ হাতে তার রিভলবার। অন্ধকারে রিভলবার চকচক করে উঠলো।

ইকরাম আলীর মুখখানা কালো হয়ে উঠলো প্রথমে, তারপর রক্ত শূন্য হয়ে ফ্যাকাশে আকার ধারণ করলো। বললো ইকরাম আলী, আবার তুমি এসেছো?

বললো জমকালো মূর্তি—হাঁ।

ইকরাম আলী বললো— কি চাও? আমার হাতখানা তো তুমি নিয়েছো আর নিয়েছো আমার ছেলের বৌকে।

একটু হাসির শব্দ হলো, বললো জমকালো মূর্তি— তোমার হাত নিয়েছি— এবার তোমার চোখ দুটো উপড়ে নেবো বলে এসেছি।

চোখ দুটো উপড়ে নেবে, বলো কি?

হাঁ, ভেবেছিলাম দক্ষিণ হাত হারিয়ে তুমি কিছুটা সৎ হবে কিন্তু তা তুমি হওনি, বরং তোমার অসৎ ব্যবসা আরও জোরদার হয়েছে, তা ছাড়াও তুমি তোমার সন্তান সমতুল্য কয়েকটি ছেলের প্রতি যে অন্যায় করেছ তার ক্ষমা নেই— হত্যা করেছ দু'জনকে আর বাকি সবাইকে দুষ্কৃতিকারী বলে জেলে পাঠিয়েছো।

তুমি, তুমিই তাহলে ঐ ডাকাত দলের সর্দার?

সর্দার নই, তাদের হিতাকাঙ্খি বন্ধু আমি।

আর?

আর তোমার আজরাইল, যাকে বলে যমদূত।

কে?.কে তুমি?

হয়তো আমার নাম তুমি শুনে থাকবে— দস্যু বনহুর। দস্যু বনহুর বলেই সবাই আমাকে ডাকে।

তুমিই সেই দস্যু বনহুর?

হাঁ।

জল্লাদ। তুমি জল্লাদ। জল্লাদ বলেই আমার সর্বনাশ করেছ, আমি তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেব।

ইকরাম আলীর কথা শেষ হয় না, বনহুর বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরে ইকরাম আলীর গলা, প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দেয় তার চোয়ালে।

এক ঘুষি খেয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে ইকরাম আলী।

তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এলো তার তখন সে দু'চোখে আর পৃথিবীর আলো দেখতে পায় না! চোখ দুটো ইকরাম আলীর উপড়ে নিয়েছে দস্যু বনহুর।

অন্ধ ইকরাম আলী যেদিন বাড়ি ফিরে এলো, সেদিন তার বাড়ি বলে কিছু ছিল না। লেলিহান অগ্নিশিখা তার সবকিছু গ্রাস করে ফেলেছিল। অকস্মাৎ একদিন বাড়ির কোন এক চাকরাণীর ল্যাম্প থেকে পাক ঘরে আগুন ধরে যায়। সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাড়িতে। ইকরাম আলীর সমস্ত বাড়িখানা ভষ্মীভূত হয়ে যায়, গ্রামবাসীরা সেদিন কেউ এগিয়ে আসে না বাড়ির আগুন নেভাতে।

আজ ইকরাম আলী অন্ধ।

হসপিটাল থেকে ফিরে এসে সে আর তার সহকারীদের দেখা পায়নি, তারা এখন আর আসে না তার পাশে তাকে সহানুভূতি জানাতে।

তারা জানে, এখন যে ইকরাম আলীর পাশে আসবে তাকেই কিছু না কিছু সাহায্য করতে হবে, কারণ আজ ইকরাম আলীর কিছু নেই— বাড়ি-ঘর, গরু-বাছুর, ধন-সম্পদ এমনকি এক মুঠো ধানও নেই তার সম্বল।

গ্রামবাসী দু'চারজন ছাড়া সবাই বিমুখ ছিল ইকরাম আলীর উপর, তাই কেউ তার দুর্দিনে এগিয়ে এলো না তাকে সাহায্য করতে। বরং সবাই খুশি হয়েছে নরপশু ইকরাম আলীর দুর্দশা দেখে।

পথের ধারে একটা জলচৌকি নিয়ে বসে থাকে ইকরাম আলী। কোন পথচারী পথ দিয়ে হেঁটে গেলে ডাকতে থাকে— কে যাও বাবা, একবার শুনে যাও আমার কাছে.....

কেউ ডাক শুনে আসে, কেউ অবহেলা করে চলে যায়।

ইকরাম আলী তাদের ডেকে বলে— বাবা, তোরা হাটে যাচ্ছিস বুঝি? আমার কাছে তো পয়সা নেই, যদি মনে করে চার আনা পয়সার তামাক আনতিস্ তাহলে বড় উপকার হতো। আনিস্ বাবা মনে করে।

হাটুরে পথিক বলতো আনবো কিন্তু একটু সরে গিয়েই বলতো, তামাক না ছাই আনবো। চোখ থাকতে কম জ্বালিয়ে খাওনি।

এমনি করে সবাই চলে যায়, কেউ তার কথা শোনে না বা ফিরে চায় না।

পাগল ছেলে হাবলু কিছু বোঝে না, সে শুধু দিনরাত পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কেউ দিলে খায়, না দিলে উপোস পাড়ে, পথের ধারে ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে ঘুমায়।

ইকরাম গৃহিণী সম্পত্তির শোকে পাগলিনীপ্রায় হয়ে পড়েছে। একদিকে স্বামী অন্ধ তারপর ছেলে পাগল, ঘরদোর কিছু নেই। দিনে দিনে ঋণের বোঝা বেড়ে যায়, একদিন জমি-জমা যা ছিল তাও নিলাম হয়ে যায়।

সেদিন অন্ধ ইকরাম আলী ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে গ্রামবাসীদের দরজায় দরজায় ভিক্ষার জন্য হাত পেতে বেড়ায়।

বেশিদিন নয়, সামান্য ক'মাসের মধ্যেই ইকরাম আলীর জীবনে নেমে আসে চরম পরিবর্তন। একদিন যে ছিল গ্রামের মাতব্বর আজ সে পথের ভিখারি। এরই নাম অদৃষ্টের পরিহাস।

❑

হঠাৎ চমকে উঠে গোলাপী, ফিরে তাকাতেই চোখ দুটো তার আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠে— মালেক ভাই তুমি!

হাঁ আমি, কিন্তু তুমি এখানে?

সে অনেক কথা— পরে শুনো, এখন বসো দেখি। গোলাপী একটা মাদুর বিছিয়ে দেয় দাওয়ায়।

বৃদ্ধ মালেকের সঙ্গেই উঠানে প্রবেশ করেছিল। বৃদ্ধ বললো— মা গোলাপী , মালেক অনেকদিন পর বাড়ি এসেছে, ওকে ভালমত রান্না করে খেতে দাও। বৃদ্ধ কথাটা বলে বেরিয়ে যায় তার কাজে।

গোলাপী বলে— মালেক ভাই, সেই যে তুমি আসবে বলে চলে গেলে, আর এলে না। জান, তুমি চলে যাবার পর হাজরা গ্রামে কত অঘটন ঘটেছে। কিচ্ছু তুমি জান না। জানলে অমন নীরব থাকতে পারত না। গ্রামের যারা ভাল ছেলে তারা আজ কেউ নেই। আমার শ্বশুরের চক্রান্তে

তারা আজ জেলে। রাজু ভাই আর শাজাহান ভাইকে ওরা মেরে ফেলেছে .... কণ্ঠধরে আসে গোলাপীর।

মালেক একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে— সব আমি শুনেছি এবং তার প্রতিকারও আমি করেছি

প্রতিকার তুমি করেছ?

হাঁ তাইতো এতদিন আসতে পারিনি। দেখাও করতে পারিনি তোমার সঙ্গে। রাজু আর শাজাহান বুকের রক্ত দিয়ে সিক্ত করেছে দেশের মাটি। তারা চেয়েছিল অন্যায় রোধ করতে ..... তারা বিফল হয়নি— জীবন দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে অন্যায়কে ধ্বংস করতে হলে জীবন দিতে হয়। আর যারা জেলে আটক আছে, তারা অচিরেই বেরিয়ে আসবে। গোলাপী, আমি বসেছিলাম না, এতদিন আমার সেই ভাইদের জেল থেকে বের করে আনার ব্যবস্থাই করলাম।

সত্যি, মোখলেছুর ভাই আর তার সঙ্গীরা মুক্তি পাবে?

হাঁ, তারা নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে। গোলাপী তোমাকে একবার নিয়ে যাবো হাজরা গ্রামে।

না না, আমি আর সেই হাজরা গ্রামে ফিরে যেতে চাই না। আমি দেখতে চাই না আমার শ্বশুর-শাশুড়ির মুখ ...

একটু হেসে বললো মালেক মিয়া— এখন গেলে আর তারা তোমাকে অবহেলা করবে না। তোমাকে পেলে তারা ধন্য হবে।

বলো কি মালেক ভাই।

হাঁ। যাবে তুমি সেই গ্রামে?

একবার যেতে ইচ্ছে হয়, আবার ভয়ও হয় আমার।

কোনো ভয় নেই, আমি কালই তোমাকে নিয়ে যাবো সেখানে।

আচ্ছা তাই যেও কিন্তু আমি সেখানে থাকবো না বেশিক্ষণ।

পরদিন মালেক মিয়া গোলাপীকে নিয়ে রওনা দিল হাজরা গ্রাম অভিমুখে।

গরুগাড়ি চেপে চলেছে ওরা।

গাড়ির মধ্যে বসেছে গোলাপী আর গাড়ির সম্মুখভাগে গাড়োয়ানের পাশে বসেছে মালেক মিয়া।

যখন গোলাপী আর মালেক মিয়া বৃদ্ধের কাছে বিদায় নিল তখন বৃদ্ধের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। কতদিন গোলাপী ছিল তার কাছে। নিজ

কন্যার মতই বৃদ্ধ ওকে স্নেহ করত, ভালবাসতো। অবশ্য গোলাপীও বৃদ্ধটিকে ভালবেসেছিল, নিজের পিতার মত তাকে ভক্তি করত।

গোলাপী তার বাড়িতে আসার পর কোন অভাব ছিল না। সেই জমকালো পোশাকপরা লোকটা তাকে প্রচুর অর্থ দিয়েছিল যা সে সারাটা জীবন বসে খেলেও ফুরাবে না।

গরিব বৃদ্ধ গোলাপীকে তাই লক্ষ্মী মা বলেই মনে করত, আজ বিদায় মুহূর্তে সে না কেঁদে পারল না। গোলাপীও কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেললো, বড় মায়া বসে গিয়েছিল তারও।

গাড়িতে বসেও মন খারাপ লাগছিল গোলাপীর। এখানে আসার পর সে বেশ সুখেই ছিল, ছিল না কোন গালমন্দ বা মারপিট। যা মনে করত তাই সে করে আনন্দ উপভোগ করত। মাঝে মাঝে আসতো তার সেই অজানা অচেনা বন্ধু। গোলাপী তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতো যেন। মাসে একটিবার আসা চাই-ই তার, নাহলে গোলাপী কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিত।

হেসে বলতো বন্ধু— পাগলী মেয়ে, আমি কি চিরদিন এমনি করে তোমার পাশে আসতে পারি। যখন দূরে চলে যাবো, অনেক দূরে তখন কেমন করে আসবো, বলো?

বলেছিল গোলাপী— তুমি দূরে চলে যাবে এ কথা আমি ভাবতে পারি না বন্ধু। তোমার মায়া আমাকে বেষ্টন করে ফেলেছে। তুমি না এলে আমি মরে যাবো....

গাড়িতে বসে গোলাপী সে কথাই ভাবছিল। মুখখানা তার গম্ভীর থমথমে, চোখ দুটো কেমন ছলছল করছিল।

মালেক মিয়া বললো— বোন, কি ভাবছো?

গোলাপী একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে বললো— কিছু না।

মিথ্যা কথা বলছো— কিছু ভাবছো তুমি।

মালেক ভাই!

বলো?

একটা কথা বলবো?

বলো।

হাজরায় গেলে আমার সেই বন্ধু এসে যদি ফিরে যায়? আমি যে তাকে ছাড়া বাঁচব না।

গোলাপী, তোমার সেই বন্ধু আমারও বন্ধু বটে। তাই আমি জানি সে আর ঐ গ্রামে যাবে না।

কেন যাবে না সে?

সে জানতে পারবে তুমি নেই সেখানে তাই।

জানতে পারবে?

হাঁ, পারবো।

তবে কোথায় তার দেখা পাবো?

তুমি যেখানেই থাকো না কেন, সেখানেই আসবে সে।

সত্যি বলছো মালেক ভাই?

হাঁ, সত্যি।

এতক্ষণে গোলাপীর মুখখানা প্রসন্ন হয়ে উঠলো, সে বললো—তুমি তাকে বলে দিও মালেক ভাই, আমি হাজরায় ফিরে এসেছি।

আচ্ছা বলবো।

একটু থেমে বললো গোলাপী— মালেক ভাই, কবে কখন তার তোমার দেখা হয়েছিল?

ঠিক স্মরণ নেই, তবে দেখা হয়েছিল— আবার হবে।

সত্যি আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে তার?

হবে।

তাকে বলো মালেক ভাই, সে যেন হাজরায় এসে আমার সঙ্গে সঙ্গে দেখা করে যায়।

বেশ, বলবো।

আচ্ছা মালেক ভাই?

বলো?

তার বাড়ি কোথায় তুমি জান? কোথায় থাকে সে আর কোথা থেকে সে আসে যায়, বলতে পার মালেক ভাই?

তা ঠিক জানি না, তুমি তাকে যেমন চেনো আমিও তাকে ঠিক তেমনি চিনি, তার বেশি তাকে জানি না।

মালেক ভাই, বড় অদ্ভুত সে— যেমন তার হাসি, তেমনি তার কণ্ঠস্বর, তেমনি তার চোখ দুটো— আমি কিছুতেই তার কথা ভুলতে পারি না। সেদিন যদি ঐ মুহূর্তে সে গিয়ে হাজির না হতো তাহলে বড় সাহেব আমার

সবকিছু ছিনিয়ে নিতো, আমি সর্বস্ব হারাতাম। আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ মালেক ভাই।

মালেক মিয়া কোন কথা বলে না, সে নীরবে তাকিয়ে থাকে সম্মুখের দিকে।

গরুগাড়ি এগিয়ে চলেছে।

হাজরা গ্রামে পৌঁছে গাড়ি ছেড়ে দিল মালেক মিয়া। গোলাপীকে বললো— চলো বোন, এবার হেঁটেই চলো।

গোলাপী তাতে কোন আপত্তি করলো না।

চলতে চলতে বললো গোলাপী— মালেক ভাই, আমার শ্বশুর-শাশুড়ি জানে ডাকাত আমাকে নিয়ে গেছে, আমি ঘরের বার হয়েছি— তারা আমাকে ঘরে তুলে নেবে তো?

সে ভাবনা তোমাকে করতে হবে না। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি তোমাকে পেলে ধন্য হবে বোন, বুঝলে? তবে তুমি যদি তাদের ক্ষমা কর ....

এ তুমি কি বলছো মালেক ভাই!

হাঁ, এসো আমার সঙ্গে।

মালেক মিয়া আর গোলাপী কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছলো ইকরাম আলীর বাড়ির অদূরে। বাড়ির নিকটে পৌঁছতেই গোলাপীর চক্ষুস্থির হলো। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—একি সে বাড়ি কোথায়?

বললো মালেক মিয়া— সব গ্রাস করেছে অন্যায় অনাচারের আগুনের শিখা। আরও সরে এসো, দেখবে আরও কিছু ....

বাড়ির কাছে এগুতেই গোলাপী দেখলো এক অন্ধ বৃদ্ধ লাঠি হাতে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে এগিয়ে আসছে।

গোলাপী ভাল করে লক্ষ্য করতেই অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো —একি, এ যে আমার শ্বশুর!

হাঁ, এই তোমার শ্বশুর ইকরাম আলী ....

কিন্তু ...

অদৃশ্য দু'টি হাতের ইংগিতে সব ওর নিঃশেষ হয়ে গেছে, আজ ও ভিখারি।

মালেক মিয়া আর গোলাপীর কথাগুলো শুনতে পেল অন্ধ ইকরাম আলী সে বললো— কে— কে কথা বলে?

মালেক মিয়া বললো— আমি আপনার পুরোন ভৃত্য মালেক মিয়া।

লাঠিসহ বাম হাতখানা প্রসারিত করে দেয় ইকরাম আলী —মালেক, বাবা মালেক,, তুই এসেছিস আমার দুঃখ দেখতে? কে তোর পাশে কথা বললো আর একজন? যার গলার স্বর আমার মনে অনাবিল শান্তির দোলা জাগালো? কে কে— আমার বৌ মা?

হাঁ মালিক, আপনার সেই বৌমা যাকে একদিন ডাকাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল, যাকে আপনি বাড়িতে আশ্রয় দেব না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই গোলাপী।

বৌমা .... এসেছো বৌমা.... ইকরাম আলী সম্মুখে এগুতে লাগল— কোথায় তুমি মা, দেখ আমার দুর্দশা দেখ মা। আজ আমি পথের ফকিরে পরিণত হয়েছি। সব গেছে আমার— বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পদ সব গেছে— আজ আমি নিঃস্ব অসহায় ....মা, মাগো ঐ যে সামনে কুঁড়েঘর দেখছো, এখন ওটাই আমার আশ্রয়স্থল ঐ ঘরে তোমার শাশুড়ি মা আছেন, সেও অসুস্থ। যাও মা তোমার শাশুড়ি মায়ের কাছে যাও। মাফ করে দাও আমাদের সব অপরাধ।

গোলাপী তাকালো তার মালেক ভাইয়ের মুখের দিকে, মালেক মিয়া বললো— গোলাপী, বোন আমার— মানুষ বলে, ক্ষমা সমান গুণ নেই। যাও, ক্ষমা করে দাও তোমার শ্বশুর-শাশুড়িকে।

গোলাপী অন্ধ শ্বশুরের হাত চেপে ধরলো, গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল তার দু'ফোঁটা অশ্রু।

মালেক মিয়া যখন কথা বলছিল তখন সেস্থানে অপর ব্যক্তি কেউ ছিল না, শুধু ইকরাম আলী আর গোলাপী ছিল।

মালেক মিয়া বললো— ইকরাম আলী, তোমার কর্মফল তুমি ভোগ করেছ। এরপর যদি গোলাপীর উপর কোন, অন্যায় অনাচার হয় তাহলে ক্ষমা নেই তোমার .....

মালেক মিয়ার কথা শুনে গোলাপী বিস্ময় নিয়ে তাকালো তার মুখের দিকে, এ কণ্ঠস্বর তো তার মালেক ভাইয়ের নয়— এ যে তার বন্ধুর গলা!

ইকরাম আলীও চমকে উঠে ভীষণভাবে, বলে উঠে সে— কে কে তুমি?

মালেক মিয়া তার মুখ থেকে দাঁড়িগোঁফ খুলে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে গোলাপী —মালেক ভাই তুমি...

হাঁ, আমিই তোমার সেই অজানা অচেনা বন্ধু।

ইকরাম আলী বলে উঠে— ডাকাত। তুমিই ডাকাত?

হাঁ।

তুমিই আমার সর্বনাশ করেছ?

হাঁ। আমার বাড়িতে আমারই চাকর মালেকের বেশে বাস করে আমার বাড়িতে বারবার হানা দিয়েছো।

হাঁ দিয়েছি।

তুমিই মহাজনের নৌকায় হানা দিয়ে তার সর্বস্ব লুটে নিয়েছিলে?

হাঁ নিয়েছিলাম, আর বিলিয়ে দিয়েছিলাম তোমারই দুঃস্থ প্রতিবেশীদের মধ্যে।

তুমি—তুমিই বড় সাহেবকে হত্যা করেছ?

হাঁ, আমি তাকে হত্যা করে আমার বোন গোলাপীকে তার পাপ বাসনা থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

দাঁতে দাঁত পিষে বলে ইকরাম আলী—তুমি—তুমি আমার ডান হাতখানা নষ্ট করে দিয়েছো?

শুধু তোমার ডান হাতখানা নয়, তোমার চোখ দুটোও আমি উপড়ে নিয়েছি, কারণ যে হাত দিয়ে তুমি পরের অন্যায় করেছ, যে চোখ দিয়ে তুমি দুঃস্থ অসহায় মানুষের সর্বনাশ করেছ সেই অঙ্গগুলো তোমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোমাকে আমি পাপমুক্ত করেছি। ইকরাম আলী সাহেব, আপনার ধনসম্পদ সবই পাপের উপার্জিত ছিল, তাই অগ্নিশিখা আপনার ধনসম্পদ গ্রাস করেছে। এখন আপনি সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়েছেন। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধু এবং আপনার দুঃস্থ প্রতিবেশীদের নিয়ে সুখে সংসার করুন। অনুভব করুন দুঃস্থ জনগণের অবস্থা কেমন! বনহুর শেষ কথাগুলো বলার সময় ইকরাম আলীকে আপনি বলে সম্বোধন করলো।

ইকরাম আলী নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার তার রাগ ক্রমে শিথিল হয়ে এলো, হয়তো তার পূর্বের অপকর্মের জন্যে অনুশোচনা জাগলো মনে। কিছু বলতে গেল ইকরাম আলী কিন্তু পারল না। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো। চোখ দুটো ভিজে উঠলো, গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বললো সে—আমার কর্মের জন্য আমি অনুতপ্ত, দুঃখিত। মা বৌমা, আমাকে তুমি মাফ করে দিয়েছো? বলো, বলো মা?

গোলাপী দু'হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলে ইকরাম আলীকে। তারপর ফিরে তাকিয়ে দেখে মালেক ভাই কখন উধাও হয়েছে, আশেপাশে কোথাও তাকে দেখা যায় না।

❑

বানরী কন্যা আজ মনুষ্য কন্যা শাপলা বনে গেছে। আজ তাকে দেখলে কেউ বলতেই পারবে না সে একদিন সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় চার পায়ে ভর করে হাঁটতো। কথা সে বলতে পারত না, বানরের মতই অদ্ভুত ধরনের শব্দ করত। আজ শাপলা সুন্দর কথা বলতে শিখেছে। ডাগর ডাগর দুটি চোখে অপূর্ব মায়াভরা চাহনি।

সব সময় শাপলা আশার কাছে কাছে থাকে! আশাকে ও বোন বলে ডাকে, ওর কাছেই ঘুমায় শাপলা এখন।

আশা ওকে শিখিয়েছে কে ওর বাবা কে ওর মা ছিল। বানরী ওকে কেমনভাবে মানুষ করেছে, সব রাতে শুয়ে শুয়ে বলতো আশা— বনহুর তাকে উদ্ধার করেছে, সে না হলে তাকে আজ আশা মানুষ রূপে গড়ে তুলতে পারত না।

একদিন বনহুর শাপলার বাবাকে নিয়ে এলো সঙ্গে করে, প্রথমে শাপলা তাকে কিছুতেই বাবা বলে মেনে নিতে চাইলো না, বনহুর নিজে অনেক করে বোঝালো ওকে। আশাও বোঝালো, তার মার মৃত্যু হবার পর তাকে বুকে করে বাঁচতে চেয়েছিল বৃদ্ধ কিন্তু বানরী তাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ায় তার বৃদ্ধ বাবা কেঁদে কেঁদে পাগল বনে গিয়েছে।

শাপলা এক সময় বুঝলো এবং বাবা বলে বৃদ্ধের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বনহুর আর আশার মন ভরে উঠলো আনন্দে। বানরী কন্যা শাপলা আজ তার পিতাকে আনন্দে গ্রহণ করতে পেরেছে বলে খুশি হলো তারা ভীষণ।

বনহুর বললো এক সময়— আশা, তুমি আমার কাছে কি চাও বলো? যা চাইবে তা আমি তোমাকে দেব। তুমি একটা অস্বাভাবিক মেয়েকে স্বাভাবিক করেছ, আজ আমি তোমার অতুলনীয় গুণে মুগ্ধ হয়েছি।

আশা নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল, বনহুরের কথাগুলো তাঁর হৃদয় স্পর্শ করলো। চোখ তুলে তাকালো আশা, কোন কথা সে বললো না।

বনহুর সরে এলো আরও কাছে, বললো— কথা বলছো না কেন আশা?

কি বলবো বলো?

তুমি কি চাও আমার কাছে বলো?

এ কথা আরও একবার তুমি বলেছিলে।

হাঁ কিন্তু তুমি কিছুই চাওনি।

কিইবা চাইবো তোমার কাছে! তোমার ভালবাসাই আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ।

আশা!

বনহুর, এবার আমি বিদায় নিতে চাই?

চলে যাবে আশা?

হাঁ, ছুটি দাও আমাকে।

বেশ, এবার তোমার ছুটি।

তুমি আমাকে রায়হান পৌঁছে দেবে না?

যদি বলো দেব।

হাজরার কাজ তোমার শেষ হয়েছে?

হয়েছে।

তোমার সেই গোলাপীর কি করলে?

তাকে শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

বেশ করেছ।

বৃদ্ধ শ্বশুর আর বৃদ্ধা শাশুড়ির সেবাযত্ন করে গোলাপী জীবন কাটিয়ে দেবে।

স্বামীর সেবা ওর ভাগ্যে হলো না। বললো আশা।

বনহুর একটা সিগারেট ধরালো, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছুড়ে বললো— শুনেছি হাবলু নাকি এখন পূর্বের মত পাগলামি করে না। সে অনেকটা সভ্য হয়েছে, গোলাপী যদি তাকে গ্রহণ করে মন্দ হবে না। সত্যি আশা, কি বলবো তোমাকে, বেচারী গোলাপীর জন্য বড় মায়া হয়। খোদা ওর মঙ্গল করুন। এই কামনা করি।

আশার মুখখানা করুণ হয়ে উঠলো, সে বললো— গোলাপীর জন্য আমারও মায়া হয়। পৃথিবীতে কত অসহায় নারী আছে যাদের অদৃষ্ট এমনি মর্মান্তিক।

এর জন্য দায়ী আমাদের সমাজব্যবস্থা। বনহুর কথাটা বলে উঠে দাঁড়ায়।

এমন সময় রঘুনাথ প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানায়।

বনহুর বলে— কি সংবাদ রঘু?

হিন্দল পুলিশ বাহিনী জানতে পেরেছে আপনি হিন্দল এসেছেন। তাজের খুরের আওয়াজ তারা শুনতে পেয়ে শিকারী কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে।

কি বললে, হিন্দল পুলিশ বাহিনী শিকারী কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে?

হাঁ, সর্দার।

হিন্দল পর্বত এলাকা এবং বনাঞ্চল তন্ন তন্ন করে সন্ধান করে চলেছে। তাজের খুরের চিহ্ন ধরে কুকুরগুলো এগিয়ে আসছে, পিছনে এগুচ্ছো হিন্দল পুলিশ বাহিনী।

বনহুর হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেট দূরে নিক্ষেপ করে অট্ট-হাসিতে ফেটে পড়ল।

আশা বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল বনহুরের মুখের দিকে। বনহুরকে হাসতে দেখে আশার মুখেও হাসির আভাস ফুটে উঠলো, সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকালো রঘুর দিকে।

রঘুনাথ তখন থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর হাসি থামিয়ে বললো— রঘু, বাঘা কোথায় আছে?

কান্দাই আস্তানা থেকে তাকে জম্বু নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে আপনার নির্দেশমতই একটি আধো অন্ধকার কক্ষে রাখা হয় এবং তাকে শুধু টাটকা মাংস খেতে দেয়া হয়।

হাঁ, ঠিকমতই কাজ করেছ তোমরা।

সর্দার, শুধু আপনি ছাড়া বাঘা কাউকে সহ্য করতে পারে না। আপনি তাকে এনেছিলেন, তাই সে আপনার অনুগত দাস হয়েই আছে ...

রঘুর কথা শুনে হাসলো বনহুর, তারপর বললো— তুমি চলে যাও, আজই বাঘাকে নিয়ে এসো। সাবধানে নিয়ে আসবে যেন কেউ টের না পায়। জম্বু থেকে যে সুড়ঙ্গপথ চলে এসেছে, সে পথেই বাঘাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে।

আচ্ছা সর্দার

বেরিয়ে গেল রঘু।

আশা বললো— বাঘা কে এবং কি সে—মানুষ না জানোয়ার?

বাঘার পরিচয় জানতে চাও?

হাঁ বনহুর।

বাঘা কুকুর। তাকে আমি পেয়েছিলাম শত্রুর কাছ থেকে। অসীম শক্তিশালী এই কুকুরটি এবং তার বুদ্ধিও আছে প্রচুর। আমার বিশ্বাস হিন্দল পুলিশ বাহিনীর বুলডগগুলোকে বাঘা একাই কাবু করে ছাড়বে।

এখানে যখন আশা আর বনহুরের কথা হচ্ছিলো তখন হিন্দল জঙ্গলে হিন্দল পুলিশ বাহিনী আর তাদের শিকারী কুকুর মিলে বনহুরের অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে এগুচ্ছে। পুলিশ বাহিনীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আর শিকারী কুকুরগুলোর গলায় চামড়ার বেল্ট।

ভীষণ চেহারার কুকুরগুলো মাটি শুঁকে শুঁকে অগ্রসর হচ্ছিল। পুলিশ বাহিনী কুকুরগুলোকে অনুসরণ করে চলেছে।

ওগুলো যেন কুকুর নয়, এক একটা হিংস্র ভয়ঙ্কর জীব। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখগুলোতে শ্যেন দৃষ্টি, লকলক করছে জিভ তাদের। সুতীক্ষ্ণ দাঁতগুলো জিভের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, যেন এক একটি ধারালো অস্ত্র।

ভীষণ ভয়াল কুকুরগুলোর সম্মুখে শত্রু এলে তাদের আর রক্ষা নেই, মাংস ছিড়ে নাড়িভুড়ি বের করে খাবে।

সমস্ত দিন ধরে হিন্দল পুলিশ বাহিনী চষে ফিরলো হিন্দলের নির্জন বনভূমি। শিকারী কুকুরগুলোও হিমসিম খেয়ে গেল যেন, ওরা অবসন্ন হয়ে পড়ল এক সময়।

হিন্দল পুলিশ বাহিনী যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ফিরে চললো শহর অভিমুখে, তখন ভীষণ ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো।

পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে দিশেহারা হয়ে ছিল শিকারী কুকুরগুলো।

ঝড়ের মধ্যে ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো বনভূমি। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, রাশি রাশি ধূলোবালি ছড়িয়ে পড়ছে তাদের চোখেমুখে।

ওরা হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে লাগল।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হিন্দল পুলিশ বাহিনী শুনতে পেল একটা ভীষণ গর্জন, যেন মেঘ ডাকার শব্দ হচ্ছে।

হিন্দল পুলিশ বাহিনী প্রধান মিঃ হিংহু চমকে উঠলেন সে শব্দে, বললেন— এ শব্দ মেঘের গর্জন নয়, হিংস্র জন্তুর গলার আওয়াজ।

বিশেষ করে শিকারী কুকুরগুলো কেমন যেন শব্দ করে পিছু দৌড়াতে শুরু করলো।

মিঃ হিংহু পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে বললেন— আমাদের কুকুরগুলো অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে।

একজন পুলিশ অফিসার বললেন— স্যার, আমরা বহু ঝড়বৃষ্টি অতিক্রম করে কাজ করেছি, কোনদিন শিকারী কুকুরগুলোকে এমনভাবে ভীতু হয়ে পিছু হটতে দেখিনি।

ঝড়ের বেগে কথাগুলো টুকর টুকর হয়ে গেল। কে কোন্‌দিকে ছুটছে তার দিশা নেই।

মিঃ হিংহু বললেন— এ ঝড় প্রাকৃতিক ঝড় নয়।

আশ্চর্য হলেন পুলিশ অফিসার মিঃ নিশা, ছুটতে ছুটতে তিনি বললেন— এ ঝড় প্রাকৃতিক নয়, এ কথা কে বললো স্যার?

আমি বলছি। বললেন মিঃ হিংহু।

চোখেমুখে এসে পড়ছে ঝড়ের ঝাপটা। শুকনো লতাগুল্ম আর আগাছা এসে পথ রোধ করে ফেলছে ওদের।

গাছপালা ভেঙ্গে পড়ছে ঝড়ের মুখে, সেকি ভীষণ কাণ্ড। এমন ঝড় তারা কোনদিন দেখনি।

মিঃ হিংহু তাকালেন আকাশের দিকে, বিস্ময় জাগলো তাঁর মনে, কারণ এমন ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও আকাশে তারকারাজি চক চক করছে। আকাশ পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে।

হিন্দল পুলিশ বাহিনীর বিস্ময় জাগছে— একি কাণ্ড, হঠাৎ এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হলো কেমন করে। আকাশে মেঘ জমেনি বা তেমন কোন ঝড়ো হাওয়াও দেখা যায়নি, হঠাৎ ঝড় এবং সেই সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাত।

এমন ভীষণ ঝড়ো-হাওয়ায় ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে পড়ল সবাই!

সে অদ্ভুত গর্জনের শব্দ আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে।

গর্জন যতই নিকটবর্তী হচ্ছে ততই কুকুরগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে এলোপাতাড়ি দৌড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হিন্দল পুলিশ বাহিনী ক্লান্ত হয়ে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ল।

এখানে যখন হিন্দল পুলিশ বাহিনী সামনে এগুনোর জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে, তখন বনহুরের হিন্দল আস্তানার ভূগর্ভে একটি গহ্বরে বিরাট একটি মেশিনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর। সুইচ অন করে মেশিনের চাকা ঘুরাচ্ছে বনহুর, সম্মুখে একটি যন্ত্রের দিকে তার দৃষ্টি, মুখমণ্ডল কঠিন।

আশা এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

বললো আশা— কি করছো বনহুর?

কোনো জবাব দিল না সে আশার প্রশ্নের। আশা বুঝতে পারল বনহুর অত্যন্ত ব্যস্ত। হয়তো বা আশার কথা তার কানেই পৌঁছলো না।

আশা নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে, ওর মুখখানায় ফুটে উঠেছে বলিষ্ঠতার ছাপ।

ভূগর্ভে লাল বাল্ব জ্বলছিল।

বনহুরের মুখে লাল আলোর আভা এসে পড়ায় ওকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। আশা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারল না।

বনহুর কিছুক্ষণ একটানা মেশিন চালালো, তারপর ফিরে তাকালো আশার দিকে।

আশাকে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললো বনহুর— এখানে এসেছো?

হাঁ, এলাম, কি করছো তুমি?

হিন্দল পুলিশ বাহিনী আর শিকারী কুকুরগুলো আমার সন্ধান করে ফিরছিল, তাই তাদের কিছু শায়েস্তা করা প্রয়োজন মনে করেছি।

আমি জানতে চাই কিভাবে তুমি শত শত মাইল দূর থেকে তাদের শায়েস্তা করবে?

জানতে চাও আশা?

হঁ।

বেশ, তাহলে এসো আমার পাশে।

বনহুর একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে মেশিন চালাচ্ছে। আশা উঠে এলো তার পাশে।

বনহুর বললো— এই যন্ত্রের কাঁচে দৃষ্টি ফেলো আশা, তাহলেই দেখতে পারবে সবকিছু।

আশা দৃষ্টি ফেললো যন্ত্রের কাঁচে, বিস্ময়ে স্তব্ধ হলো সে— দেখলো অন্ধকারে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে এলোপাতাড়িভাবে দৌড়াদৌড়ি করছে কতগুলো লোক এবং তাদের সঙ্গে দৌড়াচ্ছে কতগুলো ভীষণ চেহারার কুকুর। আশা পরিষ্কার সবকিছু দেখতে পাচ্ছে, বললো এবার সে— আচ্ছা আকাশে তো মেঘ নেই, তবে এমন ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে কেন? আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি....

বনহুর বললো— আশ্চর্য নয়, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। এই যে যন্ত্রটা দেখছো, এটা ঝড়বৃষ্টি আর তুফানের সৃষ্টিকর্তা। আর এই যে পাশে যে সুইচটা দেখছো, এটা টিপলে একটি রশ্মি বেরিয়ে আসবে— অতি ভয়ঙ্কর সে রশ্মি।

সে রশ্মিতে কি কাজ হয়?

তুমি দেখতে চাও? যদি বলো আমি সেই আলোকরশ্মির সুইচ অন করে ঐ পুলিশ বাহিনী আর তাদের শিকারী কুকুরগুলোকে এক্ষুণি ভস্মে পরিণত করতে পারি।

না না, তা হয় না, এতগুলো প্রাণীকে তুমি এভাবে ধ্বংস করতে পার না বনহুর।

বনহুর হেসে বললো— প্রয়োজন হলে হয়তো ঐ আলোক রশ্মি মেশিন আমাকে ব্যবহার করতে হবে। তবে যতক্ষণ আমি নিজকে সংযত রাখতে পারবো ততক্ষণ ঐ সুইচে চাপ দেব না।

বনহুরের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছিল আশা। সত্যি এমন বিস্ময়কর আলোকরশ্মি সম্বন্ধে সে কোনদিন শোনেনি। আরও সে কোনদিন দেখেনি মেশিনের দ্বারা প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি সৃষ্টি করা। আশা পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মেশিনের মধ্যে যন্ত্রটার আয়নায়। আশা দেখতে পেল হিন্দল পুলিশ বাহিনী ভিজে নেকড়ে বাঘের মত লুটোপুটি খেয়ে ছুটছে। তার সঙ্গে ছুটছে কুকুরগুলো।

বনহুর বললো— ওরা প্রায় বনাঞ্চল পার হয়ে গেছে, আর কিছুটা এগুলোই রেহাই পাবে......

আশা বলে উঠলো— একটা ভীষণ আকার জন্তু দেখতে পাচ্ছি, জন্তুটা হিন্দল পুলিশ বাহিনীর কুকুরগুলোকে তাড়া করে চলেছে ....দেখ দেখ বনহুর, জন্তুটা একটা কুকুরকে ঘায়েল করে ফেললো, মেরে ফেললো একেবারে।

বনহুর আশার মুখের কাছে মুখ নিয়ে জন্তুটার কাছে দৃষ্টি ফেললো, তারপর হেসে বললো— ওটা জন্তু বটে তবে অন্য কোন জন্তু নয়—ওটা কুকুর এবং ওরই নাম বাঘা।

বাঘা এসে গেছে তাহলে?

হাঁ, বাঘা জম্বু ঘাটিতেই ছিল, তাই হিন্দল সুড়ঙ্গপথে দ্রুত আনা সম্ভব হয়েছে। বাঘা বড় দুঃসাহসী এবং শক্তিশালী, বাঘাকে আমি কোথায় পেয়েছি একদিন বলবো তোমাকে।

আশার দৃষ্টি তখনও সেই যন্ত্রের আয়নায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। অবাক হয়েছে আশা বনহুরের অদ্ভুত যন্ত্রের কারসাজি দেখে। মেশিনের সাহায্যে এমনভাবে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে, এ যেন কল্পনার বাইরে।

আশা বললো— হিন্দল পুলিশ বাহিনী চরমভাবে নাজেহাল হয়েছে, তার সঙ্গে কুকুরগুলোও। এবার তুমি তোমার অদ্ভুত মেশিন অফ্ করে দাও বনহুর।

তাহলে তুমি খুশি হও?

ওরা যেভাবে শায়েস্তা হয়েছে তাতে আর কোনদিন এ মুখো হবে না। কিন্তু তোমার বাঘাকে ফেরাবে কি করে?

বাঘা ঠিক এসে যাবে। কথাটা বলে বনহুর তার ঝড়বৃষ্টির মেশিনের সুইচ টিপে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ঝড় বৃষ্টি -তুফান।

বনহুর নেমে এলো মেশিনের পাশ থেকে নিচে। তার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে ঐ মুহূর্তে সে অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে।

ঝড়বৃষ্টি-দুর্যোগ মেশিন অফ্ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো রঘু আর রামসিং।

উভয়ে এসে কুর্ণিশ জানিয়ে দাঁড়ালো।

বললো রামসিং — সর্দার, মেশিন অফ্ করে দিয়ে ভাল করলেন কি?

রঘু বললো— সর্দার, হিন্দল পুলিশ বাহিনী আর শিকারী কুকুরগুলো এখনও বনভূমির বাইরে বেরিয়ে যায়নি, তারা আবার এগুতে পারে।

বনহুর নিশ্চিন্ত মনে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললো —তারা আজ রাতে আর এগুতে সক্ষম হবে না রঘু, যদি এগোয় তবে তখন দেখা যাবে। আজ বাঘাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর।

কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেল রামসিং আর রঘু।

❑

হিন্দল পুলিশ বাহিনী ভীষণভাবে নাকানি চুবানি খেয়ে ফিরে এলো হিন্দল জঙ্গল থেকে। শিকারী কুকুরগুলোর অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছে। সবাই ভিজে নেকড়ে বাঘের মত অবস্থা।

শিকারী কুকুরগুলোর কয়েকটি জীবন হারিয়েছে। শক্তিশালী বাঘার কবল থেকে তারা নিস্তার পায়নি। বাঘার কাছে ওরা একেবারে ভিজে বিড়ালের মত অবস্থা হয়ে পড়েছিল।

হিন্দল পুলিশ প্রধান এবং মিঃ হিংহুর আলোচনা চলছিল। অফিসরুমে আরও অনেক পুলিশ অফিসার বসে আছেন। সবার চোখেমুখেই চিন্তিত ভাব ফুটে উঠেছে।

গত ঘটনা তাদেরকে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। জীবনে তাঁরা এমনভাবে নাকানি চুবানি খাননি কোনদিন।

বললো— হিংহু— স্যার, হঠাৎ এমন ঝড়বৃষ্টি আসবে, এ যেন কল্পনার বাইরে। সম্পূর্ণ আকাশ স্বচ্ছ ছিল, আকাশে ছিল অগণিত তারকা। এমন কি আকাশে একখন্ড মেঘও ছিল না।

হিন্দল পুলিশ প্রধান বললেন— বিস্ময়কর ঘটনা বটে। আপনি কি বলতে চান কালকের ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে প্রকৃতির কোন যোগাযোগ ছিল না?

স্যার, বিশ্বাস করুন কালকের ঝড়বৃষ্টি ছিল বড় অদ্ভুত। ঐ ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে প্রাকৃতিক কোন যোগাযোগ ছিল বলে আমার মনে হয় না। নিশ্চয়ই ওটা কোন.....

বলেন, থামলেন কেন? বললেন পুলিশ প্রধান মিঃ নাং চিয়ু।

মিঃ হিং বললেন— স্যার, আমরা যাকে পাকড়াও করব বলে সন্ধান করছিলাম কালকের ঝড়বৃষ্টির পিছনে আছে তারই কারসাজি....

আপনি কি বলছেন মিঃ হিংহু।

হাঁ স্যার, আমার মনে হয় এই দুর্যোগ সৃষ্টিকারী স্বয়ং দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর !

হাঁ, কারণ তার অসাধ্য কিছুই নেই। হয়তো এমন কোন মেশিন আছে যার দ্বারা সে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি তৈরি করে আমাদের পথরোধ করেছিল। তাছাড়া যে ভয়ঙ্কর কুকুরটি আমাদের শিকারী কুকুরগুলোকে নিহত করেছে, সে কুকুরটিও তারই একজন অনুচর।

অপর একজন পুলিশ অফিসার বললেন— স্যার, আমরা জন্তুটার হাত হতে বাঁচার জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। কুকুর তো নয় যেন একটা হিংস্র ব্যাঘ্র। একটা কুকুর এতগুলো কুকুরকে ঘায়েল করলো অথচ আমরা কোন কিছু করতে পারলাম না।

ঠিক বলেছ, কুকুর নয় যেন একটা ভয়ঙ্কর জীব। আকারে যেমন বৃহৎ তেমনি ভীষণ চেহারা। কি বলবো স্যার, আমরা একেবারে নাজেহাল হয়ে উঠেছিলাম।

পুলিশ প্রধানের চক্ষুস্থির, কারণ এমন তাজ্জব ব্যাপার কোনদিন তাঁরা দেখেননি বা শোনেননি। মেশিনের দ্বারা ঝড়বৃষ্টি-তুফান হয় এ কেমন কথা! তবে আজকাল বিজ্ঞানের যুগ, নানা রকম মারাত্মক মেশিন এবং যন্ত্রের আবিষ্কার ঘটেছে। সে সব যন্ত্রের দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়।

তবু যেন বিশ্বাস হয় না মিঃ হিংহুর কথাগুলো পুলিশ প্রধান মিঃ নাংচিয়ুর, তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন— যেমন করে হোক দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতেই হবে। জম্বু পুলিশ মহল থেকে সংবাদ এসেছে দস্যু বনহুর হিন্দল অভিমুখে এসেছে, তাকে গ্রেফতার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন জম্বুর অধিনায়ক।

মিঃ হিংহু বললেন— স্যার চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি কিন্তু এমনভাবে আমাদের হয়রানি হতে হবে, ভাবতে পারিনি আমরা।

আমাদের কুকুরগুলো এখন কোথায় আছে মিঃ হিংহু?

মিঃ হিংহু ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিল— পুলিশ গুদামে কুকুরগুলোকে রাখা হয়েছে। স্যার, কুকুরগুলো বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

পুলিশ প্রধান কঠিন কণ্ঠে বললেন— তবু আপনাদের পুনরায় চেষ্টা চালাতে হবে। পুনরায় যেতে হবে হিন্দল বন অভিমুখে। আমাদের শিকারী কুকুরগুলো যত অবসন্নই হোক না কেন, দু'দিনেই সবল হয়ে উঠবে। এক্ষুণি কুকুর পালককে জানিয়ে দিন তাদেরকে যেন ভাল খাবার এবং কাঁচা মাংস খাওয়ানো হয়। প্রতিদিন এক একটি কুকুরকে চার সের কাঁচা মাংস খাওয়ানো দরকার।

আচ্ছা স্যার, আপনার নির্দেশমতই কাজ করব। বললেন মিঃ হিংহু।

সেদিনের কথাটা সমস্ত শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে। সবার মুখেই সেই অদ্ভুত ঝড়বৃষ্টি আর দুর্যোগের কথা। আকাশে মেঘ নেই, বাতাস নেই হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া, তার সঙ্গে ভীষণ বৃষ্টিপাত। যদিও এই ঝড়ো হাওয়া বনজঙ্গলেই হয়েছিল তবু শহরের অনেকেই আঁচ করেছিল কিছুটা।

❑

হিন্দল শহরবাসীরা যখন বনহুর আর হিন্দল পুলিশ বাহিনী সম্বন্ধে নানা রকম আলাপ আলোচনা করছিল, তখন বনহুর তার হিন্দল আস্তানায় আধো অন্ধকার একটি কক্ষে বসে বাঘার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছিল।

বনহুর বসে আছে একটি সামান্য উঁচু আসনে। আর তার পায়ের কাছে বসে আছে বাঘা। যে বাঘার কাছে হিন্দল পুলিশ বাহিনী নাজেহাল পেরেশান হয়ে গেছে, যে বাঘা নিহত করেছে কয়েকটি হিন্দল শিকারী কুকুরকে, যে বাঘার সঙ্গে তুলনা হয় না কোন কুকুরের।

বিরাটদেহী জমকালো কুকুর বাঘা। চোখ দুটো ক্ষুদে কিন্তু অত্যন্ত তীব্র, যেন ছোট ছোট দুটি আগুনের বল। দাঁতগুলো লম্বা তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রের মত। বাঘাকে দেখলে যে কোন সাহসী ব্যক্তির হৃদকম্প হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বনহুরের পায়ের কাছে দু'পায়ের মধ্যে মাথা রেখে বসেছিল বাঘা।

বনহুর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো আর মাঝে মাঝে নাম ধরে ডাকছিল ওকে। কখনও বা শিষ দিচ্ছিলো, তখন বাঘা মুখ তুলে লেজ নাড়ছিল একটু একটু করে।

এমন সময় আশা এলো, সঙ্গে সঙ্গে বাঘা উঠে দাঁড়িয়ে ভীষণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো আশার দিকে।

আশা ভয় পেয়ে গেল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বললো বনহুর— যেও না আশা, বাঘা তোমাকে কিছু বলবে না।

আশা থমকে দাঁড়িয়ে তাকালো বাঘার দিকে।

বাঘার চোখ দুটো ভয়ঙ্করভাবে জ্বলছে, যেন দু'টি আগুনের গোলক।

বনহুর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো— বাঘা, ও আমাদের লোক। বস্, তুই বসে যা, এক্ষুণি তোর খাবার আসবে।

আশা ততক্ষণে বনহুরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়েছিল বাঘার সঙ্গে সঙ্গেই, সে মনে করেছিল হঠাৎ যদি বাঘা আশাকে আক্রমণ করে বসে তাহলে রক্ষা নেই। বাঘার কবল থেকে আশাকে উদ্ধার করা কঠিন হবে কিন্তু বাঘা আশাকে হঠাৎ আক্রমণ না করে তাকালো বনহুরের দিকে। আদেশ পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে এমনি তার মনোভাব।

বনহুর যখন বাঘাকে শান্তকণ্ঠে বসতে বললো তখন সে না বসে পারল না।

আশা অবাক হয়ে দেখছে, সে ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে অদ্ভুত যন্ত্রের কাঁচে দেখেছিল এক অদ্ভুত জীব— সে এই বাঘা। অন্যান্য কুকুরের সঙ্গে এর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না— মুখটা থেবড়ো চোখ দুটো ক্ষুদে, চোয়ালের দুপাশে কালো— চোয়ালের ফাঁক দিয়ে সূতীক্ষ্ণ দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে দু'পাশে মাঝখানে লকলকে জিভখানা।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো— আশা ভারি অদ্ভুত কুকুর বাঘা। বনহুর, আমি এমন কুকুর কোনদিন দেখিনি।

ঐ মুহূর্তে লিয়ং একটা গামলাভর্তি তাজা মাংস নিয়ে হাজির হলো।

বনহুর ওর হাত থেকে গামলাটি নিয়ে মেঝেতে রাখলো, তারপর এক একখন্ড তুলে নিয়ে ছুড়ে দিতে লাগল সে বাঘার মুখ গহ্বরে।

বাঘার তখন আনন্দ ধরে না, লেজ নেড়ে নেড়ে সে বনহুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভাব জমিয়ে তুলছিল।

আশা মুগ্ধ হলো।

একখণ্ড মাংস তুলে নিয়ে সেও বাঘার দিকে এগিয়ে ধরলো।

বাঘা কিন্তু এতক্ষণ বাঁকা চোখে আশাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, কেমন যেন সন্দেহপূর্ণ ভাবে তাকাচ্ছে সে আশার দিকে।

এবার আশাকে একখণ্ড মাংস তুলে নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে ধরতে দেখে চট করে মাংস গ্রহণ করতে পারল না সে, ফিরে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর একটু হেসে বললো— নে খেয়ে নে, নে বাঘা। ওর নাম আশা— আমার বন্ধু, বুঝলি? নে, নে বাঘা।

এবার বাঘা না নিয়ে পারলো না।

আশার হাত থেকে মাংস খন্ড নিয়ে গোগ্রাসে গিলে ফেললো বাঘা।

আশা পুনরায় আর একটি মাংসখণ্ড দিল ওর মুখে। সেটিও বাঘা খেয়ে ফেললো।

বাঘা কিছুক্ষণের মধ্যেই আশার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললো।

বনহুর দেখে মুগ্ধ হলো, বললো সে —বানরীকন্যা শাপলাকে তুমি মানবী বানিয়ে ছেড়েছো, তাকে বশীভূত করে ফেলেছিলো নিজের বোনের মত করে— আর বাঘাতো জন্তু, ওকে বশিভূত করতে তোমার মোটেই সময় লাগবে না।

সে কথা মিথ্যা নয়, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বাঘা আশার ভক্ত হয়ে পড়ল। আধো অন্ধকার ঘরে সমস্ত দিন বাঘা বন্দী থাকে, রাত যখন গভীর হয় তখন বাঘাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। বাঘার সঙ্গে থাকে রঘু কিংবা বনহুর।

আশা একদিন বাঘাকে নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল।

বনহুর যেদিন বিদায় নিয়ে চলে গেছে কান্দাই অভিমুখে, আশার একা মোটেই ভালো লাগছিল না! আজকাল বাঘা আশার বাধ্য হয়ে গেছে, তাই আজ যখন বারবার ওর মনটা বনহুরের জন্য কেমন করছিল তখন বাঘাকে নিয়ে আশা বের হলো।

হিন্দল জঙ্গল আশার তেমন পরিচিত নয়, তবু আশা প্রায়ই বের হতো রাতের অন্ধকারে। অন্যান্য দিনের মত আজও আশা বের হলো, বাঘা রয়েছে তার সঙ্গে।

আগে আগে এগুচ্ছে আশা, পিছনে বাঘা। মাঝে মাঝে আশা বাঘার মাথায় হাত ঝুলিয়ে দিচ্ছিলো। বাঘা এতে খুশি হচ্ছিলো অনেক, সেও লেজ নেড়ে নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলো।

আজ আশার মন ভাল নেই, তাই অন্যমনস্কভাবে পথ চলছিল। মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল বনহুরের মুখখানা। যদিও আশা বনহুরকে কোনদিন নিবিড়ভাবে পায়নি তবু সে পেয়েছে তার স্বচ্ছ-পবিত্র ভালবাসা। আশা তাতেই খুশি, তৃপ্ত, আনন্দিত। আশা ওর কাছে বেশি কিছু চায় না, চায় শুধু ওকে পাশে পেতে। জানে আশা, ওকে সে ধরে রাখতে পারবে না। রাখা যাবেও না কোনদিন তবু মন চায় ওকে ধরে রাখতে। বনহুর হিন্দল পুলিশ বাহিনী এবং হিন্দল শিকারী কুকুরগুলোর দৃষ্টি এড়িয়ে অতি স্বাভাবিকভাবেই হিন্দল থেকে চলে গেছে।

পুলিশ বাহিনী কিন্তু সেই ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আর তুফানের কথা বিস্মৃত হয়ে পুনরায় হিন্দল জঙ্গল অভিমুখে রওনা দিল, এবার তারা শিকারী কুকুরগুলো সঙ্গে নেয়নি, নিয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র।

ওরা গোপনে অতি সতর্কতার সঙ্গে বনজঙ্গল অতিক্রম করে এগুচ্ছে। ওদের দেহে ছিল জংলী জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ। সহসা কেউ দেখলে যাতে চিনতে না পারে বা বুঝতে সক্ষম না হয়, সে জন্যই তারা এ ধরনের পোশাক পরিধান করেছিল।

আশা যখন বাঘাকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দল জঙ্গল অতিক্রম করে সম্মুখস্থ একটি ঝিলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো তখন হঠাৎ একটা গুলী এসে বিদ্ধ হলো আশার পিঠে।

সঙ্গে সঙ্গে আশা পড়ে গেল মাটিতে।

আশা ভাবতেও পারেনি এমন একটা বিপদ তার জন্য ওৎ পেতে ছিল সেখানে।

আশা মাটিতে পড়ে যেতেই বাঘা ঘেউ ঘেউ করে উঠলো, সে ছুটলো যেদিক থেকে গুলী এসে বিদ্ধ হয়েছিল সেদিকে কিন্তু কাউকে সে ঐ মুহূর্তে খুঁজে পেল না। একটু পরই সে ফিরে এলো আশার পাশে, এসে বাঘা আর আশাকে দেখতে পেল না। মাটিতে পড়ে আছে চাপ চাপ তাজা রক্ত। বাঘা চারদিকে সন্ধান করে দেখতে লাগল। আশাকে খুঁজে না পেয়ে বাঘা পুনরায় ছুটলো যেদিক থেকে গুলী এসেছিল সেইদিকে। মাটি শুঁকে শুঁকে অগ্রসর হলো বাঘা কিন্তু তেমন কোন গন্ধ সে আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছে না।

তবু বাঘা চললো, হঠাৎ এক জায়গায় এসে বাঘার নাকে শত্রুর গন্ধ প্রবেশ করলো। বাঘার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ রাগে ফুলে উঠলো বাঘার দেহের লোমগুলো। বাঘা শত্রুর সন্ধান পেয়েছে। সে মাটি শুঁকে শুঁকে এগুতে লাগল। বেশ কিছুটা এগুতেই বাঘা তাকালো গাছের উপরে। সে দেখলো বিরাট একটি গাছ, তার ডালে বসে আছে কয়েকজন লোক।

বাঘা বুঝতে পারল তারাই আশাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিল। যদিও রাতের অন্ধকার তখন জমাট হয়ে এসেছে তবু বাঘার দৃষ্টি থেকে রেহাই পেল না আশার শত্রুরা। বাঘা তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

সমস্ত রাত ধরে বাঘা গাছের তলায় বসে রইলো। এক মুহূর্তের জন্যও সে গাছের তলা থেকে সরে গেল না। রাগে বাঘা ফুলছে, তার চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলছে যেন। বাঘার সে কি ভীষণ চেহারা— এই মুহূর্তে কেউ সামনে পড়লে তার রক্ষা নেই।

গাছের ডালে যারা উঠে বসেছে তারা হলো হিন্দল পুলিশ বাহিনী। তারা অতি গোপনে এবং সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছিলো। মাঝে মাঝে উঁচু টিলা বা গাছের ডালে বসে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখছিল কোথাও কিছু দেখা যায় কিনা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল তবু হিন্দল পুলিশ বাহিনী ক্ষান্ত হয়নি। হবার কোন উপায়ও ছিল না, কারণ সরকারি নির্দেশ রয়েছে— তারা ফিরে যেতে পারবে না যতক্ষণ না দস্যু বনহুরকে তারা গ্রেফতার করতে সক্ষম না হয় বা সন্ধান না পায়। পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন নামকরা অফিসার এবার এসেছেন, অবশ্য এরা পূর্বের অনুসন্ধানকারী দলেও ছিল।

পুলিশ বাহিনী কয়েকজন ভড়কে গিয়েছিল, সন্ধ্যার অন্ধকার যতই ঘনীভূত হচ্ছিলো ততই ভীত হচ্ছিলেন তাঁরা, অবশ্য কয়েকজন নির্ভীক পুলিশ অফিসার এ দলে ছিল যারা ভয় পাবার লোক নন।

হিন্দল জঙ্গল হাতড়ে বেড়ানো যে কতবড় দুঃসাহসের কথা, হয়তো অনেকেই না জানলেও হিন্দল পুলিশ বাহিনী জানে।

তারা যখন অগ্রসর হচ্ছিলো তখন হঠাৎ তাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা ছিল সেই ভীষণ চেহারার কুকুরটি আর এক নারী মূর্তি।

হিন্দল পুলিশ বাহিনীর যারা ইতিপূর্বে বনহুর গ্রেফতার অভিযানে পড়ল তাঁরা চিনে ফেললেন বাঘাকে। এ কুকুরটিই তাঁদের কতগুলো শিকারী কুকুরকে ঘায়েল করে ফেলেছে এবং কয়েকটিকে নিহত করেছে।

দলের প্রধান যিনি ছিল তিনি নির্দেশ দিল, কুকুরটিকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়ো। কুকুরটিকে হত্যা করে ঐ নারীকে গ্রেফতার করতে হবে, তাহলেই আমরা সন্ধান পাবো দস্যু বনহুরের।

দলপতির নির্দেশ পাওয়ামাত্র পুলিশ বাহিনীর একজন অভিজ্ঞ পুলিশ তার রাইফেল উঁচু করে ধরলো এবং সে বাঘাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে আশা একটু সরে এসেছিল, তাই গুলীটা বাঘার শরীরে বিদ্ধ না হয়ে বিদ্ধ হলো আশার দেহে, সঙ্গে সঙ্গে আশা মাটিতে পড়ে গেল এবং রক্তে ভিজে গেল হিন্দল জঙ্গলের শুকনো মাটি।

হঠাৎ আশাকে এভাবে পড়ে যেতে দেখে বাঘা ভীষণভাবে চমকে উঠেছিল এবং পর মুহূর্তে সে বুঝতে পেরেছিল আশার অবস্থা ভয়াবহ—কেউ বা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলী ছুড়েছিল, পশু হলেও সে ঠিক তা ধরে নিয়েছিল এবং ঐ দণ্ডে সে ছুটেছিল শত্রুর সন্ধানে, কিন্তু বেশিক্ষণ সে শত্রুর সন্ধানে মনোযোগ দিতে পারেনি। কারণ আশা রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে গেল, সে ঐ সময় কেমন আছে হয়তো এ কথাটাই বাঘার মনে উদয় হয়েছিল, তাই সে পুনরায় ফিরে এসেছিল আশার কাছে।

কিন্তু বাঘা এসে আশাকে আর দেখতে পায়নি। শুধু দেখতে পেয়েছিল তাজা রক্তের চাপ। বাঘা বেশিক্ষণ বিলম্ব করতে পারেনি, কারণ শত্রু তাহলে হাতছাড়া হবে, তাই বাঘা আবার ছুটেছিল শত্রুর সন্ধানে।

বাঘা শত্রুর সন্ধান পেয়েছে, আর সে সরে যাবে না। গাছটার অদূরে সে বসে রইলো চুপটি করে। মাঝে মাঝে উর্ধ্বমুখী হয়ে দেখে নিচ্ছিলো সে শত্রু গাছে আছে কিনা। পুলিশ বাহিনীর যারা গাছটার উপরে উঠে বসেছিল, তারা অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও বাঘাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়তে পারছিল না, কারণ বাঘা ছিল লক্ষ্যের বাইরে।

অত্যন্ত চালাক ছিল বাঘা, সে জানে শত্রুর হাতে অস্ত্র আছে, তাই সে গাছের গোড়ার দিকে লক্ষ্য রেখে বেশ দূরেই বসেছিল! যেমনি ওরা গাছ থেকে নামবে, অমনি সে আক্রমণ করবে শত্রুকে।

হিন্দল পুলিশ বাহিনী যারা বৃক্ষডালে বসেছিল তারা ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসছিল, পর পর কয়েকবার তারা বাঘাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়েছিল কিন্তু বাঘার নাগাল পায়নি তাদের নিক্ষিপ্ত গুলীগুলো।

সমস্ত রাত কেটে গেল।

বাঘা ঠায় বসে রইলো, একবারও সে সরে গেল না।

ওদিকে আশাকে ফিরে যেতে না দেখে হিন্দল ঘাটির অনুচরগণ চিন্তিত হলো। আশার সঙ্গে রয়েছে বাঘা, সেও ফিরে এলো না, ব্যাপারখানা তাদের কাছে বেশ ঘোরালো লাগছে।

কয়েকজন অনুচর আশার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল, হিন্দল জঙ্গলের প্রায় অর্ধেক চষে ফেললো তবু তারা আশার কোন সন্ধান পেল না।

সংবাদটা সঙ্গে সঙ্গে ওয়্যারলেসে জানিয়ে দিল ওরা বনহুরকে।

বনহুর তখন ফাংহায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

ফাংহায় এক অদ্ভুত কাণ্ড প্রতিদিন ঘটে চলেছে। সে হলো এক বিস্ময়কর জীবের আবির্ভাব। প্রতি রাতে ফাংহা শহরে-বন্দরে-গ্রামে এক অদ্ভুত পায়ের ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং প্রতি রাতে কোন না কোন জায়গায় পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে এক একটি মৃতদেহ। মৃতদেহগুলো কোন না কোন যুবকের। নিহত যুবকগুলোর দেহ অবিকৃত কিন্তু তাদের প্রত্যেকের বুক চিরে অতি কৌশলে হৃদপিণ্ড বের করে নেওয়া হয়েছে। মৃতদেহের অন্য কোন স্থানে কোন ক্ষতচিহ্ন নেই। তবে মৃতের চোখেমুখে এক ভয়ঙ্কর ভীতির ভাব ফুটে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

সংবাদটা বনহুরকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। কান্দাই শহরে একবার এমনি এক অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটেছিল, সে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতো লোমশ দু'টি বাহু দ্বারা, তবে এ হত্যাকাণ্ড কার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে কে জানে। বনহুর ফাংহার হত্যাকাণ্ড নিয়ে যখন গভীরভাবে চিন্তা করছিল তখন ওয়্যারলেসে সংবাদ এলো আশা হিন্দল জঙ্গল থেকে হারিয়ে গেছে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এ সংবাদে বনহুর ভীষণভাবে বিচলিত হলেও একেবারে ঘাবড়ে গেল না, সে ভ্রু কুঞ্চিত করে ভাবলো, নিশ্চয় আশাকে পুলিশ বাহিনী উধাও করেছে, নইলে সে হঠাৎ অন্তর্ধান হবে কেন?

বনহুরের ফাংহায় যাওয়া হলো না, সে হিন্দল অভিমুখে রওনা হলো।

বনহুর প্রথম জম্বু পৌঁছলো, তারপর সুড়ঙ্গপথে হিন্দল অভিমুখে রওনা দিল।

হিন্দল পৌঁছে বনহুর জানতে পারল, শুধু আশাই নয়, বাঘাও আশার সঙ্গে নিখোঁজ হয়েছে।

ঘটনাটা যেন কেমন রহস্যপূর্ণ মনে হলো বনহুরের কাছে। অনুচরগণ বহু সন্ধান করেও আশার কোনো খোঁজ পায়নি বা বাঘাকেও দেখতে পায়নি তারা।

বনহুর নিজে অনুচরদের নিয়ে প্রস্তুত হলো— সে হিন্দল জঙ্গলে সন্ধান করবে, তারপর পুলিশ মহলে খোঁজ করে দেখবে আশা কোথায় আছে।

যখন বনহুর সহচরদের নিয়ে আস্তানার বাইরে বের হবে, ঠিক ঐ মুহূর্তে বাঘা এসে সম্মুখে দাঁড়ালো।

বাঘাকে দেখে চমকে উঠলো বনহুর, বাঘার মুখে এবং দেহে রক্তের ছাপ লেগে আছে। হঠাৎ কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হলো বনহুর।

অনুচররাও কম আশ্চর্য হয়নি, একজন অনুচর রাইফেল উদ্যত করে ধরলো বাঘাকে লক্ষ্য করে, বললো—সর্দার, বাঘাই আশাকে হত্যা করেছে, দেখছেন না ওর মুখে রক্তের ছাপ। হুকুম করুন সর্দার, এক গুলীতে ওকে হত্যা করি।

বনহুর বললো— না, ওকে হত্যা করা চলবে না।

অপর একজন অনুচর বললো— বাঘা পাগল হয়ে গেছে, তাই সে আশাকে হত্যা করেছে।

বাঘা হয়তো অনুচরদের কথা বুঝতে পারল, সে বনহুরের প্যান্টের কাপড় কামড়ে ধরে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করলো।

অনুচরদের একজন বলে উঠলো —সর্দার, ও আপনাকেও কামড়াবে।

বনহুর বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো— কি হয়েছে বাঘা? আশা কোথায়? বল্ আশা কোথায়? বাঘা বনহুরের কাপড় কামড়ে তাকে বের হতে বলছে। যদিও সে কথা বলতে পারছে না তবু তার আচরণ দেখে মনে হচ্ছিলো সে তাকে তার সঙ্গে যাবার জন্য ইংগিত করেছে।

বনহুর অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো— বাঘা আমাকে তার সঙ্গে যাবার জন্য বলছে। তোমরা কয়েকজন এসো, দূর থেকে আমাকে এবং বাঘাকে অনুসরণ কর।

ততক্ষণে রঘু এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

পূর্ব হতেই সে সব শুনেছিল, এখন সে নিজেও সর্দারকে অনুসরণ করলো।

বাঘা চলেছে আগে আগে আর তার পিছনে চলেছে বনহুর।

বনহুরের অনুচরগণ দূরে থেকে বাঘা এবং সর্দারকে অনুসরণ করছে।

বনহুরের দেহে জমকালো পোশাক, মাথায় কালো পাগড়ি, পায়ে ভারী বুট, কোমরের বেল্টে গুলীভরা রিভলবার, অপর এক খাপে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা রয়েছে।

বাঘা আপন মনে অগ্রসর হচ্ছিলো। জিভটা বেরিয়ে এসেছে, চোয়ালের দু'পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ধারালো দাঁতগুলো। চোয়াল এবং মুখে রক্ত লেগে আছে— কিসের রক্ত, কার রক্ত জানে না কেউ।

বনহুর আর বনহুরের অনুচরগণ এগুচ্ছে, তাদের মনে নানা-রকম চিন্তাধারা বয়ে চলেছে।

হিন্দল জঙ্গল।

যদিও কান্দাই জঙ্গলের মত হিন্দল জঙ্গলের গভীরতা ছিল না তবু একেবারে কমও নয়। বিরাট জঙ্গলের কিছু অংশে মানুষ বা কোন জীবজন্তু প্রবেশ করতে পারত না, কারণ এ অঞ্চলে ছিল শুধু কাঁটা বন। অদ্ভুত ধরনের কাঁটা বন। —এ ছাড়াও ছিল মানুষখেকো গাছ। হঠাৎ যদি কোন জীবজন্তু বা মানুষ ভুল করে এদিকে এসে পড়তো, সে আর কোনদিন ফিরে আসতো না।

বাঘা বনহুরকে নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হলো।

জঙ্গলের বিপদজনক স্থানের দিকে সর্দারকে যেতে দেখে তার অনুচরগণ বেশ ঘাবড়ে গেল, তারা দ্রুত এগিয়ে এসে সর্দারের পথরোধ করে দাঁড়ালো।

একজন বললো— সর্দার, আর অগ্রসর হওয়া আপনার উচিত হবে না, কারণ ওদিকে গেলে কেউ ফিরে আসে না।

বনহুর বললো— তোমরা আমাকে বাধা দিও না, আমাকে যেতেই হবে বাঘা যেখানে যেতে চায় সেখানে।

অনুচররা জানতো সর্দার তাদের বাধা শুনবে না, কাজেই নিশ্চুপ রইলো।

বনহুর বললো— তোমাদের যদি ভয় হয় তবে তোমরা যেও না।

কিন্তু অনুচরগণ সর্দারের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত আছে, কাজেই তারা কেউ ফিরে যাবার জন্য পিছপা হলো না।

কিছুটা এগুতেই দেখতে পেল বনহুর, অদূরে একটি গাছের নিচে পড়ে আছে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি মৃতদেহ। মৃতদেহগুলোর দেহ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত।

বনহুর তার অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো— এই দেখ বাঘার কীর্তি। বাঘা এদের হত্যা করেছে এবং এই নিহত ব্যক্তিদের রক্তই লেগে রয়েছে বাঘার মুখমণ্ডলে।

বনহুরের অনুচরদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে এক বিস্ময়কর ভাব। তারা নিহত ব্যক্তিদের দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। এতগুলো লোককে বাঘা একা কি করে নিহত করলো ভেবে পায় না বনহুর। প্রতিটি লোকের পাশে পড়ে আছে পিস্তল, রাইফেল, রিভলবার—এক একটি আগ্নেয়াস্ত্র।

বনহুর যখন নিহত লোকগুলোকে পরীক্ষা করে দেখছিল তখন বাঘা এক অদ্ভুত ধরনের শব্দ করছিল, রাগে ফুলে উঠছিল বাঘার লোমগুলো।

বনহুরের অনুচর রঘু বললো— সর্দার, এরা কারা জান? নিশ্চয় কোন শত্রুদল।

❑

বললো বনহুর— আমি বুঝতে পেরেছি, যদিও এরা ছদ্মবেশ ধারণ করেছে তবু চিনতে আমার ভুল হয়নি— এরা হিন্দল পুলিশ বাহিনীর লোক। কিন্তু বাঘা এদের কেনই বা হত্যা করেছে, তবে কি আশাকে এরা ধরে নিয়েছিল? যদি এরা আশাকে ধরবে তবে সে গেল কোথায়?

বাঘা তখন নিহত লোকগুলোর পাশে ঘুরে ঘুরে আনন্দ উপভোগ করছিল। এবং মাঝে মাঝে বনহুরের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করছিল।

কিন্তু বাঘার কথা কেউ বুঝতে পারছিল না।

বনহুর বললো— বাঘা, তুই এদের কেন হত্যা করেছিস? বল্ কেন হত্যা করেছিস্?

বাঘা যেন বুঝতে পারল বনহুরের কথাগুলো। সে লাশগুলোর পাশ থেকে সরে এলো, তারপর বনহুরকে তার সঙ্গে চলার জন্য তার কাপড় কামড়ে ধরে ইংগিত করলো।

বনহুর বাঘার সঙ্গে এগুবার পূর্বে আর একবার লাশগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলো। প্রতিটি লাশ বাঘার দাঁত এবং নখের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। বিকৃত হয়ে গেছে তাদের মুখমণ্ডল, চিনবার উপায় নেই কাউকে।

বনহুর এবার অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো— তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি বাঘাকে অনুসরণ করছি। হয়তো আশার সন্ধান পাবো।

রঘু বললো— সর্দার, আপনি একা যাবেন?

না, বাঘা আমার সঙ্গে আছে।

তবুও আপনি .....

কিছু ভাবতে হবে না তোমাদের।

সর্দার, বাঘা যেদিকে যাচ্ছে ওদিকে বড় বিপদ আছে।

তোমরা ভয় পেও না রঘু, আমি ঠিক ফিরে আসবো।

কথাটা বলে বনহুর বাঘাকে অনুসরণ করলো।

বাঘা চলেছে তো চলেছেই।

বনহুর ভেবেছিল বাঘা যেখানে তাকে নিয়ে চলেছে হয়তো সেখানে গিয়ে আশাকে দেখতে পাবে কিন্তু সেখানে পৌঁছে বনহুর হতাশ হলো, আশার কোন সন্ধান পেল না। বাঘা যেখানে এসে মাটি শুঁকতে লাগল সেখানে শুধু আছে শুকনো রক্তের ছাপ। বনহুর শিউরে উঠলো, তবে কি আশা নিহত হয়েছে? এ রক্ত তার? বাঘা পশু, কি করে সে জবাব দেবে তার প্রশ্নের।

বাঘা বারবার রক্তের দাগগুলো শুঁকে শুঁকে এক অদ্ভুত ধরনের শব্দ করতে লাগল, হয়তো সে কিছু বলে বনহুরকে বোঝাতে চেষ্টা করছে।

বনহুর বললো— বাঘা, বল্ আশা কোথায়? বল্ এ রক্ত আশার কিনা!

বাঘা লেজ নাড়তে লাগল।

বনহুর বুঝতে পারল এ রক্ত আশার। আশাকে তাহলে হিন্দল পুলিশ বাহিনী হত্যা করেছিল। সে কারণেই বাঘাও পুলিশের লোকগুলোকে এক এক করে হত্যা করেছে। কিন্তু আশার লাশ গেল কোথায়?

বনহুর বসে পড়ল একটি পাথরখণ্ডে।

পাথরখণ্ডটা পড়েছিল রক্তের দাগের পাশেই। এতটা পথ বনহুর একটানা হেঁটে এসেছে, তাই সে কিছুটা ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়াও একটা দারুণ চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলেছে। আশার এই নির্মম মৃত্যু সে যেন সহ্য করতে পারছিল না। আশার মৃত্যু তার মনকে বিচলিত করে তুলছিল।

বনহুর যখন পাথরখণ্ডে বসে ছিল তখন পাথরখানা যেন একটু দুলে উঠলো এমনি মনে হলো তার, তবে প্রথমে বনহুর তেমনভাবে গ্রাহ্য করলো না কিন্তু একটু পরেই পুনরায় পাথরখানা নড়ে উঠলো।

এবার বনহুর বুঝতে পারল পাথরখানা কোন শূন্যস্থানে লটকানো অবস্থায় আছে। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, তারপর পাথরখানা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। অকস্মাৎ পাথরখানা সরে গেল একপাশে, বেরিয়ে এলো একটি গর্ত।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে গর্তমুখ পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

বাঘার চোখেমুখেও ফুটে উঠেছে একটা আশ্চর্য ভাব, সেও উদগ্রীব হয়ে দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে।

বনহুর পকেট থেকে বের করে লাইট ল্যাম্প জ্বালালো, সঙ্গে সঙ্গে দেখলো গর্ত নয় সেটা একটা সুড়ঙ্গমুখ। বনহুর বাঘার দিকে ফিরে তাকালো, বাঘা তখন তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

বাঘা একটু শব্দ করলো এবং সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করার জন্য পা বাড়ালো।

বনহুরের দৃষ্টি পড়ল পাথরটার গায়ে এক জায়গায় রক্তের দাগ লেগে আছে। একটা চিন্তার ছায়া ছিল বনহুরের মুখে। তবে কি আশার রক্ত পাথরটার গায়ে লেগেছে? বনহুর নিজে প্রবেশ করলো সুড়ঙ্গমধ্যে। বাঘা তাকে অনুসরণ করলো।

অন্ধকার সুড়ঙ্গমধ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে বনহুর। বাঘাও তেমনি আস্তে আস্তে এগুচ্ছে, সে বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়ই তার মনিব সুড়ঙ্গমধ্যে কিছুর সন্ধান পেয়েছে।

বনহুর এগুচ্ছিলো।

তার মনে হচ্ছে বাঘাও যেন তার একজন অনুচর। অবশ্য বনহুরের চিন্তাধারা মিথ্যা নয়, বাঘা বনহুরের অনুচরই বটে, কারণ বনহুরকে সে প্রাণাপেক্ষা বেশি ভালবাসে।

বনহুর সুড়ঙ্গপথ ধরে যতই এগুচ্ছে ততই বিস্ময় জাগছে তার মনে। গভীর জঙ্গলে অদ্ভুত এক সুড়ঙ্গপথ, কে জানে এ সুড়ঙ্গপথ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। নিশ্চয়ই আশার মৃতদেহ এই সুড়ঙ্গমধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে তাতে কোন ভুল নেই, কারণ পাথরের উপর স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সে রক্তের ছাপ। বাঘা তাকে দক্ষ অনুচরের মত অনুসরণ করে চলেছে।

বেশ কিছুটা এগুতেই বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, সে দেখলো একটা লাল আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে অদূরস্থ এক গুহা থেকে। সুড়ঙ্গমধ্যে অদ্ভুত গুহা, আশ্চর্য বটে।

বনহুর নিজের ঠোঁটে আংগুলচাপা দিয়ে বাঘাকে সতর্ক করে দিল, সে যেন কোনরকম শব্দ না করে।

বাঘা বনহুরের দিকে তাকালো এবং বনহুরের ইংগিত যেন সে বুঝতে পারল, নিশ্চুপে অতি হালকা পায়ে এগুতে লাগল বাঘা।

বনহুর সুড়ঙ্গের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দিয়ে এগুচ্ছে, যেন তার শরীরের ছায়া সুড়ঙ্গপথের মেঝেতে এসে না পড়ে। বনহুর এবার বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে চাপাকণ্ঠে বললো— বাঘা, তুই এবার ফিরে যা। সুড়ঙ্গমুখে আমার জন্য অপেক্ষা করবি। যা বাঘা, চলে যা।

বাঘা যেন বনহুরের কথা বুঝতে পারল সে ফিরে এলো সুড়ঙ্গমুখে।

বনহুর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে ঐ গুহার পাশে এসে দাঁড়ালো, যে গুহা থেকে অদ্ভুত ধরনের আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছিল। বনহুর দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে ঘাড় বাঁকা করে দেখলো— যেমনি গুহামধ্যে দৃষ্টি ফেললো অমনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো সে। দেখতে পেল গুহার মধ্যে একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আছে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর চেহারা বিরাট এবং ভয়ঙ্কর। চোখ দুটো তার মুদিত। সম্মুখে একটি ত্রিফলা আকারে লৌহশলাকা মাটিতে গাঁথা রয়েছে।

অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে ঘিরে বসে আছে আরও চারজন সন্ন্যাসী, তারা সবাই চোখ মুদিত অবস্থায় বসে আছে।

অগ্নিকুণ্ডের লালচে আলোকরশ্মিতে সন্ন্যাসীগুলোকে বড় ভয়াল, ভীষণ লাগছিল। সন্ন্যাসী দলপতি কি যেন বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছিলো।

যে মুহূর্তে সন্ন্যাসী দলপতির ঠোঁট দু'খানা চুপ হচ্ছিলো তখন তার সঙ্গীরা বিড়বিড় করে অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করছিল। কি বলছে ঠিক বুঝতে পারে না বনহুর, তবে কোন মন্ত্র হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সন্ন্যাসীগুলো আসল সন্ন্যাসী না কোন যাদুকর ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এরা ভূগর্ভে এমনভাবে আত্মগোপন করে আছে কেন আর এদের আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যই বা কি। নিশ্চয়ই এরা কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে আছে। আশাকে এরাই হত্যা করেছে, নাহলে সুড়ঙ্গমুখে রক্তের ছাপ থাকবে কেন। বনহুরের মনে নানা রকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছিলো, সে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখছিল সবকিছু।

সন্ন্যাসীরা বেশ কিছুক্ষণ মন্ত্র আওড়ালো, তারপর উঠে দাঁড়ালো তারা।

অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে কয়েকবার ঘুরে ঘুরে মন্ত্র পাঠ করলো। তারপর দলপতি তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে কিছু বললো।

সঙ্গীদের দু'জন বেরিয়ে গেল সেই অদ্ভুত গুহা থেকে।

বনহুর আরও বেশি করে দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়ালো। সন্ন্যাসী দুজন চলে গেল ওদিকে অপর একটি দরজা দিয়ে।

বনহুর স্তব্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগল। সময় যেন কাটতে চায় না। অগ্নিকুণ্ডের লালচে আলো যেন ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে, সুড়ঙ্গমধ্যে একটু একটু করে অন্ধকার বাড়ছে।

হঠাৎ একটা শব্দ হলো।

বনহুর চমকে উঠলো, এবার সে তাকালো গুহার মধ্যে। দেখলো যে দু'জন সন্ন্যাসী বেরিয়ে গিয়েছিল তারা ফিরে এসেছে গুহামধ্যে। তাদের পিছনে রয়েছে চারজন লোক। লোক চারজন একটি কাঠের বাক্স বহন করে এনেছে।

কাঠের বাক্সটা কোন একটি শবাধার বলে মনে হলো বনহুরের।

বিরাট চেহারার সন্ন্যাসী পুনরায় বসে পড়ল।

যারা এতক্ষণ উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা শবাধারটি চারজন লোকের কাঁধ থেকে নামিয়ে নিচে রাখলো।

দলপতির নির্দেশে দু'জন সন্ন্যাসী অগ্নিকুণ্ডে কিছু তেল জাতীয় তরল পদার্থ ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে লালচে এক বিস্ময়কর আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে, উঠলো গুহাটি।

বনহুর লক্ষ্য করছিল সবকিছু, মাঝে মাঝে সে কোমরের বেল্টে হাত বুলিয়ে অস্ত্রের অস্তিত্ব অনুভব করে নিচ্ছিলো। বনহুর দেখলো শবাধারটি ওরা অগ্নিকুণ্ডের পাশে রেখে গোলাকার হয়ে দাঁড়ালো।

দলপতি সন্ন্যাসীটি উচ্চকণ্ঠে কিছু মন্ত্র আবৃত্তি করলো।

সঙ্গে সঙ্গে চারজন সন্ন্যাসী বাক্সের ডালা খুলে ফেললো এবং তার মধ্য হতে বের করলো একটি নারীদেহ। বনহুরের চিনতে বাকি রইল না, শবাধার থেকে যে নারীদেহ বের করা হলো তা যে আশার দেহ তাতে কোন ভুল নেই। তবে কি আশার সত্যি মৃত্যু ঘটেছে? আশার দেহটা ওরা বের করে অগ্নিকুণ্ডের পাশে রাখলো। বনহুরের প্রাণটা হু হু করে কেঁদে উঠলো এবার— আশার দেহটা ওরা অগ্নিদগ্ধ করে খাবে।

বনহুরের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, আশা যেন তার কানে ফিস ফিস করে বললো..... আমাকে এভাবে নিঃশেষ হতে দিও না বনহুর···· আমাকে এভাবে অগ্নিদগ্ধ করতে দিও না···· তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো .... ওরা আমাকে এভাবে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে ...

বনহুর আপন মনে বলে উঠলো— না, তোমাকে আমি অগ্নিদগ্ধ হতে দেব না আশা, দেব না ....

ওরা যেমনি আশাকে তুলে নিয়েছে হাতের উপর, অমনি বনহুর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিল এক এক সন্ন্যাসীর মুখে।

আচমকা আক্রমণে সন্ন্যাসীদল ভড়কে গেল ভীষণভাবে, তারা ভাবতে পারেনি এমন একটা ঘটনা তাদের জন্য এই মুহূর্তে ঘটবে বা ঘটতে পারে। ওরা নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যাচ্ছিলো। বনহুরের আচমকা আক্রমণে ঘাবড়ে গেল সন্ন্যাসীদল, তারা আশার দেহটা ফেলে দিয়ে নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল।

সন্ন্যাসী দলপতির সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো বনহুরের।

৬

বনহুর দলপতিকে আক্রমণ করতেই অন্যান্য সন্ন্যাসী শবাধারে আশার দেহটা ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। তারা ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে ব্যক্তি তাদের ভূগর্ভ সুড়ঙ্গপথে ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছে, সে কম ব্যক্তি নয়। তাছাড়া ব্যক্তিটি যে অত্যন্ত শক্তিশালী তাতেও কোন ভুল নেই। বনহুরের কোমরের বেল্টে অস্ত্র রয়েছে, তাও তারা লক্ষ্য করেছিল এবং এ কারণেই ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল সন্ন্যাসীরা।

বনহুর সন্ন্যাসী দলপতিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাবু করে ফেললো। যদিও সন্ন্যাসী দলপতির দেহেও অত্যন্ত শক্তি ছিল তবু সে কাবু হলো বনহুরের কাছে।

পিছু হটে সে পালিয়ে গেল কোথায় কে জানে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে আশার দেহটা তুলে নিল কাঁধে, তারপর দ্রুত সুড়ঙ্গপথ ধরে উপরে উঠতে লাগল।

বনহুর কিছুটা এগুতেই একটা তীরফলক সাঁ করে তার পাশ কেটে চলে গেল এবং ভূগর্ভ সুড়ঙ্গপথের দেয়ালে গেঁথে গেল।

বুঝতে পারল বনহুর সন্ন্যাসীরা তাকে পিছন থেকে আক্রমণ করছে। হঠাৎ তার দেহে তীরফলক এসে বিদ্ধ হতেও পারে। কাঁধে আশার রক্তাক্ত দেহ। বনহুর যতদূর সম্ভব দ্রুত এগিয়ে চললো।

কিন্তু বেশিদূর না এগুতেই তার পাশ কেটে চলে গেল আরও দুটো তীরফলক। ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে, তাই বনহুর রক্ষা পেল এই তীরফলক দু'টি থেকে। ততক্ষণে প্রায় সুড়ঙ্গমুখে এসে পড়েছে বনহুর।

সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে কিছু সূর্যের আলো এসে পড়েছে সুড়ঙ্গপথে। অদূরে বাঘা দাঁড়িয়ে আছে, তার ছায়া স্পষ্ট দেখতে পেল বনহুর।

বনহুর আশা সহ বেরিয়ে আসতেই বাঘা আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো।

বনহুর ডান কাঁধে আশার দেহখানা শক্ত করে ধরে বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে নিল।

বাঘা বুঝতে পারল মনিব এ মুহূর্তে কি চায়। সে তীরবেগে ছুটলো যেখানে তাজ আপন মনে বিচরণ করে ফিরছিল।

বনহুর হিন্দল জঙ্গলে আসার সময় তাজের পিঠেই এসেছিল। শুধু বনহুর নয়, তার অন্যান্য অনুচর সবাই এক একটি অশ্ব নিয়েই অনুসরণ করেছিল বাঘাকে। বাঘা দক্ষভাবে বনহুর ও তার অনুচরদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল।

সবাই যখন অশ্ব ত্যাগ করে পদব্রজে অগ্রসর হলো তখন অশ্বগুলো জঙ্গলের নিকটে এক জায়গায় বিচরণ করে ফিরতে লাগল।

বাঘা তীরবেগে ছুটে গেল সেই জায়গায় যেখানে অশ্বগুলো ছিল।

বাঘা তাজের লাগাম কামড়ে ধরলো, তারপর এক ঝাঁকুনি দিয়ে ইংগিতে কিছু বললো।

তাজ সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

সেও বুঝতে পেরেছে বাঘার ইংগিত— বাঘা তাকে ছুটতে বলছে।

বাঘা লাফিয়ে চেপে বসলো তাজের পিঠে, তারপর দাঁতে লাগাম কামড়ে ধরে ঝাঁকুনি দিল।

তাজ এবার ছুটতে শুরু করলো।

বাঘা দু'পায়ে তাজের পিঠ আঁকড়ে ধরে বসে তাজকে চালনা করে চললো দক্ষ অশ্বারোহীর মত। তাজ ছুটলো উল্কাবেগে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল তাজ আর বাঘা।

বাঘার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বনহুরকে বিস্মিত করল। তেমনিই সে খুশিও হল কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই তার।

তাজ এসে পৌঁছবার পূর্বেই আবার আক্রান্ত হয়েছিল বনহুর। একসঙ্গে কয়েকজন অদ্ভুত সন্ন্যাসী তাকে আক্রমণ করেছিল ভীষণভাবে। বনহুর আশার দেহটা একপাশে নামিয়ে রেখে লড়েছিল তবে বেশিক্ষণ তাকে লড়তে হয়নি, কিছু সময়েই দু'জন সন্ন্যাসী মৃত্যুবরণ করায় ওরা ভীষণ ভড়কে গিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

তাজ এসে পৌঁছতেই বনহুর আশাকে নিয়ে উঠে বসলো তাজের পিঠে।

তাজ ছুটতে শুরু করলো।

বাঘা তাকে অনুসরণ করে ছুটে চললো।

❑

আশাকে নিয়ে বনহুর এক সময় পৌঁছে গেল হিন্দল ঘাটিতে।

আশাকে দেখে বুঝলো বনহুর সে মৃত্যুবরণ করেছে। সম্পূর্ণ দেহ তার সাদা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে কিন্তু আশ্চর্য, এখনও তার দেহ ঠাণ্ডা কিংবা অসার হয়ে উঠেনি। যেমন ঘুমন্ত মানুষের দেহ নরম এবং উষ্ণ হয়, তেমনি মনে হচ্ছিলো আশার দেহটা।

আশাকে বনহুর মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা এলিয়ে দিল চেয়ারে। একটা গভীর দুঃখ আর বেদনার আভাস ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে।

তার অনুচরগণ ঘিরে দাঁড়িয়েছে আশার দেহটা।

সবার মুখমণ্ডলেই বিষাদের ছায়া।

হিন্দল ঘাটিতে আশা অনেকদিন ছিল, তাই বনহুরের অনুচরগণ তাকে ভালবেসে ফেলেছিল। অবশ্য আশার ব্যবহারই অনুচরদের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে লিয়ং বেশি ভালবেসেছিল আশাকে, কারণ আশা তাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহময় চোখে দেখত।

আশার শায়িত দেহের পাশে দাঁড়িয়ে লিয়ং ডুকরে কেঁদে উঠলো।

অন্য অনুচরদের চোখগুলোও ছলছল করছে।

বনহুর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো— আশাকে খুঁজে পাওয়া গেল সত্য কিন্তু পেয়েও কোন ফল হলো না।

রঘু বললো— সর্দার, আমার মনে হয় আশার মৃত্যু ঘটেনি, কারণ তার দেহ এখনও আরষ্ট হয়ে যায়নি বা মুখমন্ডল সম্পূর্ণ রক্তশূন্য হয় নি।

বনহুরের এতক্ষণে হুশ হলো, সে আশার দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে আসলেও ভালভাবে তাকে পরীক্ষা করে দেখেনি—ওকে সে মৃতই মনে করেছিল। বনহুর তাড়াতাড়ি আশার হাতখানা তুলে নিল হাতের মুঠায়,

সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো তার চোখ দুটো। বললো বনহুর— রঘু, তুমি ঠিক বলছো— আশা মরেনি, আশা জীবিত আছে।

অনুচরগণ সবাই আনন্দিত হলো, সবার মধ্যেই ফুটে উঠলো খুশির আভাস।

বনহুর বললো—রঘু, শিগ্‌গির যাও কোন চিকিৎসককে ডেকে আনো কিন্তু সাবধান, যেন সে জানতে না পারে তাকে তোমরা কোথায় নিয়ে আসছো।

আচ্ছা সর্দার।

যাও।

রঘু এবং আর একজন অনুচর বনহুরকে কুর্নিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

বনহুর তাকালো আশার সংজ্ঞাহীন মুখের দিকে।

❑

রঘু আর হোসেন যখন ডাক্তারের কাছে এসে পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা হয়। ডাক্তার বললেন— সন্ধ্যার পর আমি কোথাও রোগী দেখতে যাই না।

রঘু অনুরোধ করে বললো— না গেলেই নয়। যত টাকা চান তাই দেব, তবু চলুন ডক্টর।

ডাক্তার বললেন— সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমি এখন যাবো না বলে দিলাম। যাও, অন্য কোন ডাক্তার দেখ।

হোসেন বললো— আমরা আপনাকে নিয়ে যাবো এবং পৌঁছে দেব— আপনি তবু চলুন, নাহলে রোগী মারা যাবে।

হোসেনের অনুরোধ তাঁকে একটুও বিচলিত করল না, ডাক্তার নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।

হোসেন এবং রঘু ফিরে এলো আস্তানায়, সব তারা বললো সর্দারের কাছে।

আশার মুমূর্ষ মুখমণ্ডলের দিকে তাকালো বনহুর, তারপর ফিরে চাইলো হোসেন আর রঘুর দিকে। রঘু বললো— সর্দার, আশাকে বাঁচানো সম্ভব হলো না, কারণ ডাক্তার আসবেন না বলে দিয়েছেন।

দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর— আসবেন না বললেই হলো— আসতেই হবে তাকে।

রঘুকে লক্ষ্য করে বললো—চলো আমার সঙ্গে।

বনহুর আর রঘু বেরিয়ে এলো বাইরে। তাজ এবং অপর একটি অশ্ব প্রস্তুত ছিল।

বনহুর আর রঘু চেপে বসল নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে।

ডাক্তারের বাড়ি চিনতে ভুল হল না বনহুর আর রঘুর।

ডাক্তার বিশ্রামকক্ষে বিশ্রাম করছিলেন। ঠিক সে মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল বনহুর।

রঘু বনহুরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, সে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে সরে গেছে দূরে।

ডাক্তার হঠাৎ চমকে উঠলেন, জমকালো একটি মূর্তি তার দিকে এগুচ্ছে।

ডাক্তার বললেন— কে আপনি?

বনহুর বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরলো ডাক্তারের জামার কলার, দাঁতে দাঁত পিষে বললো— ডাক্তার, তৈরি হয়ে নাও, যেতে হবে তোমাকে।

অবাক কণ্ঠে বললেন ডাক্তার— এই রাতে আমি কোথায় যাবো?

বনহুর কঠিন গলায় বললো— রোগী দেখতে।

সর্বনাশ।

কেন?

রাতে আমি রোগী দেখি না।

বনহুর দক্ষিণ হাতে ডাক্তারের কলার চেপে ধরেছিল, এবার সে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বললো— রাতেই যেতে হবে তোমাকে।

না, আমি যাবো না। বুঝেছি সন্ধ্যায় যে লোক এসেছিল তুমি তারই লোক?

হ্যাঁ, আমি তারই লোক। ডাক্তার, তোমার ওষুধের ব্যাগ তুলে নাও, এক্ষুণি যেতে হবে তোমাকে।

না, আমি যাবো না।

বনহুর বাম হাতে রিভলবারখানা খাপ থেকে খুলে নিয়ে চেপে ধরে বললো— চলো।

টেনে বের করে আনলো বনহুর ডাক্তারকে ঘরের বাইরে।

অদূরে তাজ অপেক্ষা করছিল।

বনহুর শিস দিল।

সঙ্গে সঙ্গে তাজ এসে দাঁড়ালো সেখানে।

অপর এক অশ্বপৃষ্ঠে রঘু।

রঘু সর্দারকে দেখে অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল।

বনহুর পকেট থেকে কালো রুমালখানা বের করে ছুড়ে দিল রঘুর দিকে, তারপর চেপে বসলো সে তাজের পিঠে।

ততক্ষণে রঘু ডাক্তারের চোখে কালো কাপড় বেঁধে নিয়েছে।